লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্

পাক্ষিক আহ্‌মদী

The Ahmadi Fortnightly
Since 1922

নব পর্যায় ৮২ বর্ষ | ১৩ম সংখ্যা

রেজি. নং-ডি. এ-১২ | ১ মাঘ, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ | ১৯ জমা. আউ, ১৪৪১ হিজরি | ১৫ সুলাহ্, ১৩৯৯ হি. শা. | ১৫ জানুয়ারি, ২০২০ ঈসাব্দ

ভালোবাসা সবার তরে
ঘৃণা নয়কো কারো 'পরে
Love for All
Hatred for None

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ঢাকার মাদারটেক হালকায় নবনির্মিত মসজিদুল হুদায় প্রথমবারের মতো সিরাতুন্নবী (সা.) জলসা, ২৭ ডিসেম্বর ২০১৯ *(বিস্তারিত ৩৬ পৃষ্ঠায়)*

দোয়ার রীতিতে মহানবী (সা.)-এর সুন্নত জীবন্ত রাখতে হুযূর (আই.)-এর তাজা নির্দেশনা

নিম্নবর্ণিত আয়াত পাঠ এবং সূরাসমূহ প্রতিরাতে ঘুমানোর পূর্বে তিনবার পড়ে নিয়ে নিজ হাতের মুঠিতে ফুঁ দিয়ে সমস্ত শরীরে (যতটুকু হাত যায়) বুলিয়ে নিবেন কেননা আমাদের প্রিয় রসূলে করীম (সা.)-এর পছন্দনীয় প্রাত্যহিক রীতি ছিল এটি।

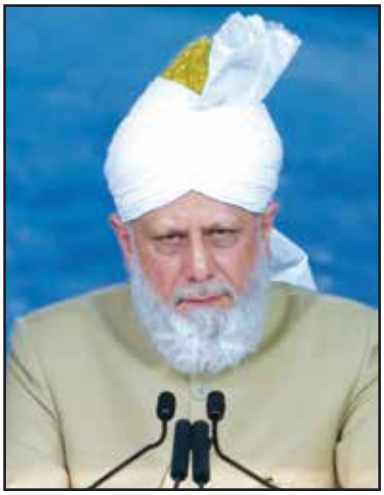

আয়াতুল কুরসী

اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلۡحَیُّ الۡقَیُّوۡمُ ۚ لَا تَاۡخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوۡمٌ ؕ لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الۡاَرۡضِ ؕ مَنۡ ذَا الَّذِیۡ یَشۡفَعُ عِنۡدَهٗۤ اِلَّا بِاِذۡنِهٖ ؕ یَعۡلَمُ مَا بَیۡنَ اَیۡدِیۡهِمۡ وَمَا خَلۡفَهُمۡ ۚ وَلَا یُحِیۡطُوۡنَ بِشَیۡءٍ مِّنۡ عِلۡمِهٖۤ اِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ کُرۡسِیُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضَ ۚ وَلَا یَـُٔوۡدُهٗ حِفۡظُهُمَا ۚ وَهُوَ الۡعَلِیُّ الۡعَظِیۡمُ ﴿۲۵۶﴾

(তিনিই) আল্লাহ্, যিনি ছাড়া কোন উপাস্য নাই। তিনি চিরঞ্জীব-জীবনদাতা (ও) চিরস্থায়ী-স্থিতিদাতা। তন্দ্রা ও নিদ্রা তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। আকাশসমূহে যা আছে ও পৃথিবীতে যা আছে সব তাঁরই। কে আছে যে তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর কাছে সুপারিশ করতে পারে? তাদের সামনে যা আছে এবং তাদের পিছনে যা আছে (সবই) তিনি জানেন। তারা তাঁর জ্ঞানের কোন নাগালই পায় না তবে (এ ক্ষেত্রে) তিনি যতটুকু চান (শুধু ততটুকুই)। তাঁর সিংহাসন আকাশসমূহ ও পৃথিবীময় পরিব্যাপ্ত। এগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ তাঁকে ক্লান্ত করে না। আর তিনি অতি উঁচু, মহামহিমান্বিত। (সূরা আল বাকারা: ২৫৬)

সূরাতুল ইখলাস

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ﴿۱﴾

قُلۡ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ﴿۲﴾ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ﴿۳﴾ لَمۡ یَلِدۡ ۬ۙ وَلَمۡ یُوۡلَدۡ ﴿۴﴾ وَلَمۡ یَکُنۡ لَّهٗ کُفُوًا اَحَدٌ ﴿۵﴾

১) আল্লাহ্‌র নামে যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী। ২) তুমি বল, তিনিই এক-অদ্বিতীয় আল্লাহ্। ৩) আল্লাহ্ স্বয়ংসম্পূর্ণ (ও) সর্বনির্ভরস্থল। ৪) তিনি কাউকে জন্ম দেন নি এবং তাঁকেও জন্ম দেয়া হয় নি। ৫) আর তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই।

সূরাতুল ফালাক

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ﴿۱﴾

قُلۡ اَعُوۡذُ بِرَبِّ الۡفَلَقِ ۙ﴿۱﴾ مِنۡ شَرِّ مَا خَلَقَ ۙ﴿۲﴾ وَمِنۡ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ۙ﴿۳﴾ وَمِنۡ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِی الۡعُقَدِ ۙ﴿۴﴾ وَمِنۡ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ﴿۵﴾

১) আল্লাহ্‌র নামে যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী। ২) তুমি বল, আমি বিদীর্ণকরণের মাধ্যমে (নতুন কিছু সৃষ্টিকারী) প্রভুর আশ্রয় চাই। ৩) (আমি আশ্রয় চাই) তিনি যা সৃষ্টি করেছেন এর অনিষ্ট থেকে। ৪) এবং অন্ধকার বিস্তারকারীর অনিষ্ট থেকে যখন তা ছেয়ে যায়। ৫) এবং সম্পর্ক-বন্ধনে (বিচ্ছেদ সৃষ্টির জন্য) ফুৎকারকারিনীদের অনিষ্ট থেকে। ৬) এবং হিংসুকের অনিষ্ট থেকেও যখন সে হিংসা করে।

সূরাতুন নাস

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ﴿۱﴾

قُلۡ اَعُوۡذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۙ﴿۱﴾ مَلِکِ النَّاسِ ۙ﴿۲﴾ اِلٰهِ النَّاسِ ۙ﴿۳﴾ مِنۡ شَرِّ الۡوَسۡوَاسِ ۙ الۡخَنَّاسِ ۪ۙ﴿۵﴾ الَّذِیۡ یُوَسۡوِسُ فِیۡ صُدُوۡرِ النَّاسِ ۙ﴿۶﴾ مِنَ الۡجِنَّةِ وَالنَّاسِ ﴿۷﴾

১) আল্লাহ্‌র নামে যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী। ২) তুমি বল, আমি মানুষের প্রভুপ্রতিপালকের কাছে আশ্রয় চাই, ৩) (যিনি) মানুষের অধিপতি ৪) (এবং) মানুষের উপাস্য। ৫) (আমি তাঁর আশ্রয় চাই) কুপ্ররোচনা সৃষ্টিকারীর অনিষ্ট থেকে, যে কুপ্ররোচনা দিয়ে সটকে পড়ে, ৬) (এবং) যে মানুষের অন্তরে কুপ্ররোচনা দেয়, ৭) সে জিনের (অর্থাৎ উঁচু শ্রেণীর মানুষের) মাঝ থেকেই হোক বা সাধারণ মানুষের মাঝ থেকেই হোক।

(জুমুআর খুতবা: ১৬ ফেব্রুয়ারী, ২০১৮)

সম্পাদকীয়

নববর্ষের নিরন্তর শুভেচ্ছা-

ভালবাসা সবার তরে
ঘৃণা নয়কো কারো 'পরে

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত ইসলামের পুনর্জাগরণ ও প্রতিষ্ঠাকল্পে সবচেয়ে দ্রুত বর্ধনশীল একটি সংগঠন। ১৮৮৯ সনে প্রতিষ্ঠিত এই জামা'ত বর্তমানে বিশ্বের ২০০টির অধিক দেশে বিস্তার লাভ করেছে। আলহামদুলিল্লাহ্ ।

আহমদীয়া মুসলিম জামাত বিশ্বাস করে যে, মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী আ. (১৮৩৫- ১৯০৮) সেই প্রতীক্ষিত মসীহ্ মওউদ যার আগমনের অপেক্ষায় দীর্ঘকাল থেকে মানুষ প্রহর গুণছে। হযরত গোলাম আহমদ (আ.) দাবি করেছেন যে, তিনিই প্রতিশ্রুত মাহ্দী এবং রূপক অর্থে হযরত ঈসা (আ.)-এর দ্বিতীয় আগমন, যার আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী স্বয়ং ইসলামের মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) করে গেছেন। আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বিশ্বাস করে যে, ধর্মযুদ্ধ রহিত করা, রক্তপাত বন্ধ করা, নৈতিক মানোন্নয়ন এবং সততা, ন্যায়বিচার ও শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য আল্লাহ্ তা'লা হযরত গোলাম আহমদ (আ.)-কে হযরত ঈসা (আ.)'এর গুণে গুণান্বিত করে প্রেরণ করেছেন।

ইসলামের প্রকৃত এবং মৌলিক শিক্ষাসমূহ তুলে ধরার মাধ্যমে ইসলামে যেসব গোঁড়া বিশ্বাস ও রীতিনীতি অনুপ্রবেশ করেছিল তা নির্মূল করেছেন। এছাড়া তিনি জরাথুস্ত্র, ইবরাহীম, মূসা, ঈসা কৃষ্ণ, বুদ্ধ, কনফুশিয়াস, লাও তাযুএবং গুরু নানকের মত মহান ধর্মপ্রতিষ্ঠাতা ও পুণ্যাত্মাদের মহান শিক্ষারও সত্যায়ন করেছেন এবং এই সমস্ত শিক্ষা প্রকৃত ও সত্য ইসলামী শিক্ষায় কিভাবে একাকার হয়ে পূর্ণতায় পৌঁছেছে তাও ব্যাখ্যা করেছেন।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত মুসলমানদের একমাত্র জামা'ত যারা দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে সকল প্রকার সন্ত্রাস ও সন্ত্রাসবাদকে প্রত্যাখ্যান করে। কারণ, ইসলামে আক্রমণাত্মক অর্থাৎ 'তরবারির জিহাদ'-এর কোন স্থান নেই। এর পরিবর্তে, ইসলামের সুরক্ষাকল্পে তিনি (আ.) স্বীয় অনুসারীদেরকে শান্তিপূর্ণভাবে 'কলমের জিহাদ' আরম্ভ করার শিক্ষা দেন। এ লক্ষ্যে তিনি (আ.) ৯০টির অধিক পুস্তক এবং দশ হাজারের অধিক পত্র লিখেন, শত শত বক্তৃতা প্রদান করেন আর অসংখ্য বিতর্কে অংশ নেন। ইসলামের সুরক্ষায় তাঁর ক্ষুরধার এবং কালোত্তীর্ণ কর্মসমূহ ধর্মের প্রথাগত ধ্যানধারণার ভিত নাড়িয়ে দিয়েছে। ইসলামের পুনর্জাগরণের প্রচেষ্টায় আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত শান্তিপূর্ণ ও সহনশীল শিক্ষার প্রচার করে থাকে; যারা রাষ্ট্র ও ধর্মের পৃথক পৃথক কর্মগণ্ডিতে বিশ্বাসী। এ জামা'ত আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলার নির্দেশ যেমন দেয় তেমনই রাষ্ট্রের সুনাগরিক হওয়ার শিক্ষাও প্রদান করে।

তিনি (আ.) কুরআনের আয়াতের অযৌক্তিক ব্যাখ্যা এবং ইসলামী আইনের অপপ্রয়োগের বিষয়েও সতর্ক করেছেন। খোদার সৃষ্টির অধিকার রক্ষার বিষয়ে তিনি ইসলামের সংবেদনশীল শাশ্বত শিক্ষা তুলে ধরেছেন। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার এবং ধর্মীয় ও অন্যান্য সংখ্যালঘুদের অধিকার রক্ষার বলিষ্ঠ প্রবক্তা হিসেবে আহমদীয়া জামা'ত কাজ করে যাচ্ছে।

নারীশিক্ষা এবং সমাজে নারীদের যথাযথ মর্যাদা প্রদানের ক্ষেত্রে এ জামা'ত সর্বাগ্রে রয়েছে। আহমদীয়া মুসলিম জামাত একজন কেন্দ্রীয় ঐশী নেতা, ইসলামের খলীফা হিসেবে যিনি পরিচিত, তাঁর হাতে ঐক্যবদ্ধ।

এই জামাত বিশ্বাস করে, কেবলমাত্র ঐশী খিলাফত ব্যবস্থাই ইসলামের প্রকৃত মূল্যবোধের সুরক্ষা করতে সক্ষম এবং মানবজতিকে এক করতে পারে। ১৯০৮ সনে হযরত আহমদ (আ.) এর মৃত্যুর পর থেকে এখন পর্যন্ত পাঁচজন খলীফা তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন। এই জামাতের পঞ্চম এবং বর্তমান ঐশী নেতা, ইসলামের খলীফা, হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) এখন যুক্তরাজ্যে বসবাস করেন।

ইসলামী খিলাফতের তত্ত্বাবধানে আহমদীয়া মুসলিম জামাত এখন পর্যন্ত ১৬,০০০ এর অধিক মসজিদ, ৫০০ এর বেশি বিদ্যালয় এবং ৩০ এর অধিক হাসপাতাল নির্মাণ করেছে। এই জামাত ৭০টির অধিক ভাষায় পবিত্র কুরআনের অনুবাদ প্রকাশ করেছে। প্রচার মাধ্যম, মুদ্রণ ব্যবস্থা (Islam International Publications), ইন্টারনেট, ওয়েবসাইট (http://www.alislam.org/) এবং একটি সার্বক্ষণিক টেলিভিশন চ্যানেল এমটিএ (http://www.mta.tv/)-এর মাধ্যমে এটি ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা এবং শান্তি ও সহনশীলতার বাণী প্রচার করে চলেছে।

একটি স্বতন্ত্র দাতব্য প্রতিষ্ঠান Humanity First (http://www.humantyfirst.org/)-এর মাধ্যমে দুর্যোগের সময় আন্তর্জাতিক ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনায় আহমদীয়া মুসলিম জামাত অগ্রণী ভূমিকা পালন করে।

সুপ্রিয় পাঠক! এসব মহতী কর্মে অংশগ্রহণের জন্য আপনিও সাদরে আমন্ত্রিত।

সূচিপত্র

১৫ জানুয়ারি ২০২০

কুরআন শরীফ ৩

হাদীস শরীফ ৪

অমৃতবাণী ৫

ইযালায়ে আওহাম (২য় অংশ) ৬

লন্ডনের মর্ডেনস্থ বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) প্রদত্ত ১২ এপ্রিল ২০১৯, মোতাবেক ১২ শাহাদত, ১৩৯৮ হিজরী শামসী'র **জুমুআর খুতবা মহানবী (সা.)-এর সাহাবী (রা.)-'গণের পুণ্যময় স্মৃতিচারণ** ৮

বিশ্বময় শান্তির সুবাতাস প্রবাহিত হোক নতুন বছরের প্রত্যাশা ১৭
মাহমুদ আহমদ সুমন

কলমের জিহাদ ২০
মুহাম্মদ খলিলুর রহমান মন্ডল

আহমদীয়া মুসলিম জামাতে বয়আত (দীক্ষা) গ্রহণের পর আমি কি পেলাম! ২৭
খন্দকার মাহবুব উল ইসলাম

আমরা মানুষ ৩৩
কৃষিবিদ মোহাম্মদ ফজল-ই-ইলাহী

সংবাদ ৩৬

পাক্ষিক 'আহমদী' নিয়মিত পড়ুন এবং গ্রাহক হোন। পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকুন না কেন পাক্ষিক **'আহমদী'**র সাথেই থাকুন। ইন্টারনেট-এর মাধ্যমে **'আহমদী'** পত্রিকা পড়তে **Log in** করুন

www.theahmadi.org

পাক্ষিক 'আহমদী'র নতুন ই-মেইল আইডি–

pakkhikahmadi.bd1922@gmail.com

কুরআন শরীফ

সূরা আল্ কাহ্‌ফ-১৮

قَالَ لَهٗ مُوْسٰى هَلْ اَتَّبِعُكَ عَلٰٓى اَنْ
تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا ﴿٦٧﴾

৬৭। মূসা তাকে বললো, 'আমি কি এ উদ্দেশ্যে তোমাকে অনুসরণ করতে পারি যাতে করে তোমাকে যা শিখানো হয়েছে সেই হেদায়াত থেকে আমাকেও কিছু শিখিয়ে দিবে[১৭০৯]?'

قَالَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِىَ صَبْرًا ﴿٦٨﴾

৬৮। সে (মহান বান্দা) বললো, 'তুমি তো আমার সাথে কখনো ধৈর্য ধরে থাকতে পারবে না[১৭১০]।

وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلٰى مَا لَمْ تُحِطْ بِهٖ خُبْرًا ﴿٦٩﴾

৬৯। আর তুমি যে বিষয়ের জ্ঞান আয়ত্ত কর নি সে সম্বন্ধে তুমি ধৈর্য ধরবেই বা কিরূপে?'

قَالَ سَتَجِدُنِىْٓ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ صَابِرًا
وَّلَآ اَعْصِىْ لَكَ اَمْرًا ﴿٧٠﴾

৭০। সে বললো, 'আল্লাহ্ চাইলে তুমি আমাকে অবশ্যই ধৈর্যশীল দেখতে পাবে এবং আমি কোন বিষয়েই তোমার অবাধ্যতা করবো না।'

قَالَ فَاِنِ اتَّبَعْتَنِىْ فَلَا تَسْـَٔلْنِىْ عَنْ شَىْءٍ
حَتّٰٓى اُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ﴿٧١﴾

৭১। সে (মহান বান্দা) বললো, 'বেশ, তুমি যদি আমাকে অনুসরণ কর তবে কোন বিষয়ে আমাকে প্রশ্ন করবে না যতক্ষণ না আমি নিজেই তোমাকে এ সম্পর্কে কিছু বলি।'

فَانْطَلَقَا ۖ حَتّٰٓى اِذَا رَكِبَا فِى السَّفِيْنَةِ خَرَقَهَا ؕ
قَالَ اَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ اَهْلَهَا ۚ لَقَدْ جِئْتَ شَيْـًٔا اِمْرًا ﴿٧٢﴾

৭২। এরপর তারা উভয়ে রওয়ানা হলো। অবশেষে তারা একটি নৌকায় চড়লো। সে (মহান বান্দা পরবর্তীতে) এটিকে ছিদ্র[১৭১১] করে দিল। সে (অর্থাৎ মূসা) বললো, 'তুমি কি এর আরোহীদের ডুবানোর উদ্দেশ্যে এতে ছিদ্র করলে? তুমি নিশ্চয় এক খারাপ কাজ করেছো।

قَالَ اَلَمْ اَقُلْ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِىَ صَبْرًا ﴿٧٣﴾

৭৩। সে বললো, 'আমি কি (তোমাকে) বলি নি, তুমি আমার সাথে কখনো ধৈর্য ধরে থাকতে পারবে না[১৭১২]?'

১৭০৯। হযরত মূসা (আ.)-কে সেই আধ্যাত্মিক জ্ঞানে উচ্চ মর্যাদা দান করা হয় নি, যে মর্যাদা রসূলে আকরম (সা.) পেয়েছিলেন।

১৭১০। মহানবী (সা.)-এর অনুসারীদের মত ভয়াবহ অবস্থাধীনে কঠিন পরীক্ষার সময় মূসা (আ.)-এর অনুসারীরা ধৈর্য এবং অবিচলিত উচ্চ স্তরের কোন নমুনা পেশ করতে পারে নি (৫:২২২৫ এবং বুখারী, কিতাবুল মাগাযী)। এই আয়াত মূসা (আ.) এবং নবী করীম (সা.)-এর স্বাভাবিক আচরণের তুলনা করেছে। মূসা (আ.) অধৈর্য হয়ে আল্লাহ্‌র বান্দাকে প্রশ্ন করেছিলেন সেই বিষয়ে যা তাঁর বোধগম্য হচ্ছিল না, পক্ষান্তরে মহানবী (সা.) ধৈর্যের সাথে অপেক্ষা করেছিলেন যে পর্যন্ত না হযরত জিবরাঈল তাঁকে বিভিন্ন বিষয়াদি সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করেছিলেন যেসব তিনি নিজের মেরাজের সময় দেখেছিলেন। এই দুই প্রসিদ্ধ নবীর প্রকৃতিতে বিদ্যমান প্রভেদ তাঁদের নিজ নিজ শিষ্যদের আচরণেও প্রতিফলিত হয়েছিল। সর্বপ্রকার অপ্রয়োজনীয় এবং নির্বোধ প্রশ্নবাণে ইহুদীরা যখন হযরত মূসা (আ.)-কে একটানাভাবে বিরক্ত ও জ্বালাতন করেছিল তখন হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর অনুসারীদের ব্যবহার ও আচরণ অত্যন্ত সংযম এবং মর্যাদায় বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ছিল। তাঁরা বিশেষ সতর্কতার সাথে নবী করীম (সা.)-কে কোন ধর্মীয় বিষয় প্রশ্ন করা থেকে বিরত থাকতেন। নবী করীম (সা.) এবং সাহাবায়ে কেরাম (রা.) উভয়ে অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সাথে ২০:১১৫ আয়াতে প্রদত্ত বিশেষ উপদেশ রক্ষা করেছিলেন যে, আল্লাহ্ সর্বোচ্চ যিনি প্রকৃত সর্বাধিপতি এবং তুমি কুরআন পাঠে তোমার প্রতি এর ওহী পূর্ণভাবে অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে তাড়াহুড়া করো না।'

১৭১১। পূর্ববর্তী কতগুলো আয়াতে হযরত মূসা (আ.)-এর 'ইসরা' সম্পর্কে কেবল ভূমিকার কাজ করেছে। বর্তমান আয়াত দ্বারা মূসা (আ.) কাশফে যা দেখেছিলেন সে সকল প্রকৃত ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ শুরু হয়েছে। 'সে এটিকে ছিদ্র করে দিল' বাক্যাংশের ব্যাখ্যা এরূপ দাঁড়ায় যে, মহানবী (সা.) এমন হুকুম জারি করবেন ঠিক যেন নৌকায় ছিদ্র করে দেয়া, স্বপ্নের ভাষায় যার অর্থ পার্থিব ধনসম্পদ অর্থাৎ তিনি এই দিকে নজর দিবেন যাতে অর্থসম্পদ অল্প সংখ্যক লোকের হাতে পুঞ্জীভূত না হয় বরং ন্যায়ের ভিত্তিতে বণ্টন করা হয়।

১৭১২। হযরত মূসা (আ.)-এর দিব্যদর্শনে আল্লাহ্‌র বান্দা মহানবী (সা.) তাঁকে বলছেন, মূসা তাঁর অনুগমন করতে পারবে না, অর্থাৎ মূসা (আ.)-এর উম্মতের লোকেরা তাঁকে সহজে গ্রহণ করবে না।

হাদীস শরীফ

মিথ্যাচারিতা খোদার অসন্তুষ্টির পথে নিয়ে যায়

কুরআনঃ

"তোমরা মূর্তিপূজার শির্‌ক থেকে বাঁচো এবং মিথ্যা থেকে দূরে থাকো।" *(সূরা হজ্জ ঃ ৩১)*

হাদীসঃ

হযরত আবু বকর (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলে করীম (সা.) বলেছেন, "আমি কি তোমাদেরকে তিনটি বড় গুনাহ্ সম্বন্ধে অবগত করবো? আমরা বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আপনি বলুন। তিনি (সা.) বললেন, আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করা এবং পিতা মাতার অবাধ্যতা করা, তিনি (সা.) তখন হেলান দিয়ে বসেছিলেন, তিনি সোজা হয়ে বসলেন এবং বললেন, খবরদার! মিথ্যা কথা বলা থেকে বাঁচো। তিনি (সা.) এ কথাটি পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করতে লাগলেন। এতে আমরা বললাম, হায়! যদি তিনি (সা.) চুপ করে যেতেন"। *(বুখারী)*

যদি সত্য দ্বারা চলা সম্ভব না হয়, তবে মিথ্যা দ্বারা চলা কখনই সম্ভব নয়। পরিতাপ এই যে, হতভাগা লোকেরা আল্লাহ্‌র সম্মান করে না। তারা জানেনা যে, খোদার আশিষ ছাড়া চলা অসম্ভব।

ব্যাখ্যাঃ

ইসলাম মানবজাতির নৈতিক ও আধ্যাত্মিক কল্যাণের সকল রাস্তাকে পরিষ্কার ভাবে তুলে ধরে মানবজাতিকে খোদার নিকট পৌঁছে দিতে চায়। পবিত্র কুরআন এ সম্পর্কে আমাদেরকে জানাচ্ছে, মূর্তিপূজা ও মিথ্যাচারিতা এবং পিতামাতার অবাধ্য হওয়া, এ তিনটি বড় গুনাহ্ মানুষকে খোদা থেকে দূরে সরিয়ে খোদার অসন্তুষ্টির পথে নিয়ে যায় এবং তার আত্মাকে ধ্বংস করে দেয়।

হযরত রসূলে করীম (সা.) বলেছেন, অংশীবাদিতা, পিতামাতার অবাধ্যতা ও মিথ্যাচারিতা মহাপাপ। মিথ্যা মানুষের আত্মাকে কলুষিত ও অপবিত্র করে দেয়।

হযরত ইমাম মাহদী (আ.) বলেন, বাস্তব কথা হলো এই যে, মানুষ যতক্ষণ না মিথ্যা পরিহার করে ততক্ষণ সে পবিত্র হতে পারে না। দুনিয়ার হীন-ব্যক্তি বলতে পারে যে, মিথ্যা ব্যতিরেকে চলা যায় না। এটা এক অযথা কথা। যদি সত্য দ্বারা চলা সম্ভব না হয়, তবে মিথ্যা দ্বারা চলা কখনই সম্ভব নয়। পরিতাপ এই যে, হতভাগা লোকেরা আল্লাহ্‌র সম্মান করে না। তারা জানেনা যে, খোদার আশিষ ছাড়া চলা অসম্ভব। তারা মিথ্যা ও অপবিত্রতাকে নিজেদের ত্রাতা ও মা'বুদ মনে করে। এজন্য আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে মূর্তির অপবিত্রতার সাথে মিথ্যার অপবিত্রতাও বর্ণনা করেছেন।

আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সবাইকে প্রকৃত পবিত্রতা দান করুন এবং সকলকে মিথ্যা বলা থেকে বিরত থাকার শক্তি দান করুন, আমীন।

আলহাজ্জ মওলানা সালেহ্ আহমদ
মুরব্বী সিলসিলাহ্

অমৃতবাণী

আমার জামা'তের জন্য কিছু উপদেশ

হযরত ইমাম মাহদী (আ.)

হে আমার প্রিয় জামাত! নিশ্চিতভাবে জেনো, যুগ নিজের শেষ প্রান্তে এসে পৌঁছেছে এবং একটি সুস্পষ্ট বিপ্লব সমাসন্ন। অতএব তোমাদের আত্মাকে প্রতারিত করো না এবং অতি শীঘ্র সত্যবাদিতায় কামেল হয়ে যাও। কুরআন করীমকে নিজেদের নেতা হিসেবে আঁকড়ে ধর এবং সর্ববিষয়ে কুরআন হতে আলো গ্রহণ কর। হাদীসকে আবর্জনার ন্যায় নিক্ষেপ করো না; কেননা এটা বড়ই প্রয়োজনীয়, এবং অত্যন্ত পরিশ্রমের সাথে এর ভান্ডার প্রস্তুত করা হয়েছে। কিন্তু যখন কুরআনের বিবরণের সাথে হাদীসের কোন বিবরণ বিরোধপূর্ণ হয়, তখন এরূপ হাদীস ত্যাগ করবে, যাতে পথভ্রষ্টতার শিকার না হও। খোদা তা'লা কুরআন শরীফকে অত্যন্ত হেফাযতের সাথে তোমাদের কাছে পৌঁছিয়েছেন। সুতরাং তোমরা এই পবিত্র কালামের সম্মান কর। কুরআনের উপর কোন কিছুকেই প্রাধান্য দিও না। কারণ সকল সততা ও বিশ্বস্ততা এর ওপর নির্ভরশীল। কোন ব্যক্তির কথা মানুষের হৃদয়কে ঐ পরিমাণে প্রভাবান্বিত করে, যে পরিমাণে ঐ ব্যক্তির তত্ত্বজ্ঞান ও তাকওয়ার ওপর তাদের আস্থা থাকে।

খোদা তা'লা কুরআন শরীফকে অত্যন্ত হেফাযতের সাথে তোমাদের কাছে পৌঁছিয়েছেন। সুতরাং তোমরা এই পবিত্র কালামের সম্মান কর। কুরআনের উপর কোন কিছুকেই প্রাধান্য দিও না। কারণ সকল সততা ও বিশ্বস্ততা এর ওপর নির্ভরশীল।

এখন দেখ! খোদা স্বীয় হুজ্জত (দলিল-প্রমাণের সাহায্যে কোন কিছুর সত্যতা প্রতিষ্ঠিত করা-অনুবাদক) তোমাদের ওপর এভাবে পূর্ণ করে দিয়েছেন যে, আমার দাবির অনুকূলে হাজার হাজার দলিল-প্রমাণ সৃষ্টি করে তোমাদের এই সুযোগ দেয়া হয়েছে-যাতে তোমরা চিন্তা কর, যে ব্যক্তি তোমাদের এই জামা'তের দিকে আহ্বান জানাচ্ছেন, তিনি কোন্ পর্যায়ের তত্ত্বজ্ঞানী এবং কি পরিমাণ যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপন করছেন। তোমরা আমার পূবের জীবনের ওপর কোন দোষারোপ করতে বা মিথ্যা বা প্রতারণার অভিযোগ আনতে পারবে না, যাতে তোমরা এ ধারণা করতে পার, যে ব্যক্তি পূর্ব হতেই মিথ্যা ও প্রতারণায় অভ্যস্ত, এটিও সে মিথ্যা বলেছে। তোমাদের মধ্যে কে আছ, যে আমার জীবনে দোষারোপ করতে পার? সুতরাং এটি খোদার অনুগ্রহ, তিনি প্রথম থেকেই আমাকে তাক্ওয়ার (খোদাভীতির) ওপর প্রতিষ্ঠিত রেখেছেন। যারা চিন্তা করে, তাদের জন্য এটা একটি দলিল।

এছাড়া আমার খোদা শতাব্দীর ঠিক শিরোভাগে আমাকে প্রেরণ করেছেন এবং আমাকে সত্যবাদীরূপে মানার জন্য যে পরিমাণ দলিল প্রমাণের প্রয়োজন ছিল তার সবটাই তোমাদের জন্য যোগান দিয়েছেন। আমার জন্য আকাশ হতে আরম্ভ করে পৃথিবী পর্যন্ত নিদর্শন প্রকাশ করেছেন এবং সকল নবী আদি হতে অদ্যাবধি আমার সংবাদ দিয়েছেন। সুতরাং এই বিষয়টি যদি মানুষের হতো তাহলে এতে এই বিপুল পরিমাণ দলিল-প্রমাণ কখনো একত্রিত হত না। উপরন্তু খোদা তা'লার সকল কিতাব এই কথার সাক্ষী, যে খোদার নামে মিথ্যা বলে, খোদা তাকে শীঘ্র পাকড়াও করেন এবং অত্যন্ত লাঞ্ছনার সাথে তাকে ধ্বংস করেন। কিন্তু তোমরা দেখছ, আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে আমার প্রেরিত হওয়ার দাবি ত্রিশ বছরের অধিক হয়েছে। যেমন বারাহীনে আহমদীয়ার প্রথম অংশের প্রতি লক্ষ্য করলে তোমরা বুঝতে পারবে।

(তাযকেরাতুশ্ শাহাদাতাইন, বাংলা সংস্করণ, পৃ: ৭৬-৭৭)

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী

ইযালায়ে আওহাম (২য় অংশ)

(সন্দেহ-সংশয় নিরসন)

প্রণয়ন ও প্রকাশনা ১৮৯১

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী (আ.)

(৩৮-তম কিস্তি)

কোন কোন ব্যক্তি এ সন্দেহ উত্থাপন করেন যে, একটি প্রশ্নের উত্তরে মহানবী (সা.) বলেছিলেন: 'দাজ্জালের যুগে যখন দিন লম্বা হয়ে যাবে অর্থাৎ বছরের সমান বা এর চেয়ে কম, তখন তোমরা নামাযের সময় আন্দাজ করে নিও।' এথেকে প্রতীয়মান হয় যে মহানবী (সা.) ঐ দিনগুলোকে বাহ্যিক অর্থেই বিশ্বাস করতেন।' এর উত্তর এ-ই যে, কেবল ধারণামূলকভাবে ধরে নিয়ে একটি প্রশ্নের উত্তর প্রশ্নকারী ব্যক্তির চাহিদানুযায়ী দেয়া হয়েছিল। প্রকৃত পরিস্থিতি কী তা বর্ণনা করা উদ্দেশ্যে ছিল না। বরং তিনি (সা.) স্পষ্টতঃ বলেছেন: 'সায়িরু আইয়ামিহি কা-আইয়ামিকুম' (অর্থাৎ 'দাজ্জালের বাকি সব দিন তোমাদের দিনের মতোই হবে' –অনুবাদক)। তা ছাড়া, এ কথাটি স্মরণ রাখা অত্যাবশ্যক যে, আমল বা বিধি-বদ্ধ কর্ম স্বরূপ যে-সব বিষয় শেখানো হয় না এবং সেগুলোতে লুক্কায়িত আংশিক ধরণের যে-সব বিষয় রয়েছে সে-গুলোও বুঝানো হয় না, সেগুলোতে আম্বিয়া 'আলাইহিমুস্ সালাম' কর্তৃক 'ইজতিহাদ' করায় ভুল-চুক ঘটার সম্ভাবনা থাকতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, কুরআন করীমে বর্ণিত কতিপয় মু'মিনের পরীক্ষার কারণ হওয়া যে-স্বপ্নটির ভিত্তিতে মহানবী (সা.) মদীনা মুনাওওয়ারা থেকে মক্কা মুয়ায্যমা পৌঁছার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন এবং বেশ কয়েকদিন লাগাতার যাত্রা করে মুবারক নগরী মক্কা পর্যন্ত পৌঁছুলেন। কিন্তু সেখানকার বৈরী অবিশ্বাসীরা খানা-কা'বার তাওয়াফ করতে বাধা দেয়। আর ঐ সময় উল্লেখিত স্বপ্নটির তা'বীর (প্রকৃত ব্যাখ্যা) প্রকাশিত হয় নি। কিন্তু নিঃসন্দেহে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর স্বপ্নও ওহীর অন্তর্ভুক্ত। তবে সেই ওহীর প্রকৃত অর্থ বুঝতে যে ভুল হয় সে সম্পর্কে তাঁকে সচেতন করানো হয় না। সে-কারণেই তো কিছু দিনের সফরের কষ্ট স্বীকার করে মক্কা মুয়ায্যমায় পৌঁছুলেন। যাত্রাপথেই যদি সচেতন করানো হতো তবে মহানবী (সা.) মদীনা মুনাওওয়ারায় ফিরে আসতেন।

অনুরূপভাবে মহানবী (সা.)-এর সম্মুখে তাঁর সহধর্মিনীগণ যখন (নিজেদের) হাত মাপতে শুরু করেছিলেন তখনও তাঁকে সচেতন করানো হয় নি। এমনকি পরিশেষে তিনি মৃত্যুবরণ করলেন। এতে করে বাহ্যত প্রতীয়মান হয়, তিনি (সা.) এ ধারণাই পোষণ করতেন যে, প্রকৃতপক্ষে তাঁদের মাঝে যাঁর হাত লম্বা তিনিই সর্বপ্রথম মারা যাবেন। এ কারণেই তাঁর (সা.) সম্মুখে হাত মাপা সত্ত্বেও তিনি (সা.) তাঁদের এমনটি করায় নিষেধ করেন নি। বলেন নি, তোমরা যা করছো এটা ভবিষ্যদ্বাণীর উদ্দেশ্য বিরোধী।

আর তেমনিভাবে, ওহীর মর্ম স্পষ্টত উন্মোচিত না হওয়া পর্যন্ত ইবনে-সাইয়াদ সম্পর্কে প্রথম প্রথম মহানবী (সা.)-এর মনে এ ধারণাই ছিল যে, সে-ই কিনা দাজ্জাল। কিন্তু পরে তাঁর (সা.) রায় বদলে গিয়েছিল।

আর তেমনিভাবে সূরা 'রূমে' বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে যে আবুবকর (রা.) শর্ত আরোপ করেছিলেন সে-প্রসঙ্গে মহানবী (সা.) স্পষ্টতঃ বলেন, '(পবিত্র কুরআনে) 'বিয্আ' শব্দটি আরবী ভাষায় ৯ (নয়) বছর পর্যন্ত প্রযোজ্য হয়। আর আমাকে নির্দিষ্টভাবে জানানো হয় নি যে, নয় বছর কালের কোন্ বছরটিতে উল্লেখিত ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হবে।

অনুরূপভাবে, নিম্নরূপ শব্দাবলী সমন্বয়ে যে হাদীসটি রয়েছেঃ 'ফাযাহাবা ওয়াহ্লি ইলা আন্নাহাল্ ইয়ামামাহ্ আও হিজ্‌র ফাইযা হিয়াল্ মাদীনাতু ইয়াস্‌রাব' (অর্থাৎ, 'হিযরত সম্পর্কে অবতীর্ণ ওহী প্রসঙ্গে প্রথমে আমার মনে এ ধারণার উদ্রেক হয়েছিল যে, সে জায়গাটি হবে ইয়ামামাহ্ বা হিজ্‌র। কিন্তু পরে সহসা দেখা গেল, সেটি 'আল্-মদীনা ইয়াস্‌রাব' –অনুবাদক)। এ হাদীসটিতে স্পষ্টতঃ প্রকাশ পাচ্ছে, মহানবী (সা.) নিজ ইজতিহদের মাধ্যমে ভবিষ্যদ্বাণীটির পূর্ণতার জায়গা ও প্রতীক বলে যা মনে

করেছিলেন সেটি ভুল প্রতিপন্ন হলো। তবে হযরত মসীহ্‌র ভবিষ্যদ্বাণীসমূহের অবস্থা সবচেয়ে বিস্ময়কর। বহুবার তিনি তাঁর প্রতি অবতীর্ণ ভবিষ্যদ্বাণীর অর্থ এক রকম ভেবেছেন এবং পরিশেষে সেগুলো বাস্তবে পূর্ণ হয়েছে অন্যভাবে। ইহুদা ইস্কুতিকে নিজ ভবিষ্যদ্বাণীতে বেহেশ্‌তের দ্বাদশ সিংহাসন দান করেন, কিন্তু সে বেহেশ্‌ত থেকে সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত থাকে। আর পিটারকে তাঁর ইজতেহাদ অনুযায়ী কখনও বেহেশ্‌তের চাবি দান করেন। আবার কখনও তাকে শয়তান বলে আখ্যায়িত করেন। অনুরূপভাবে, ইঞ্জিল থেকে প্রতীয়মান হয় যে হযরত মসীহ্‌ (আ.)-এর 'কাশ্‌ফ' বা দিব্যদর্শন খুব একটা স্বচ্ছ ছিল না। তাঁর প্রতি অবতীর্ণ কিছু সংখ্যক ভবিষ্যদ্বাণী তাঁর ভুল ইজতিহাদ বা ভুল বুঝার কারণে বাহ্যতঃ পূর্ণ হতে পারে নি, কিন্তু সেগুলোর আসল অর্থে বাস্তবত পূর্ণ হয়েছে। যাই হোক, উল্লেখিত এ যাবতীয় বিষয় থেকে নিশ্চিতভাবে এ মূলনীতি নিরূপিত হয় যে, ভবিষ্যদ্বাণীসমূহের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে আম্বিয়া আলাইহিমুস্‌ সালাম কখনও কখনও ভুলের শিকারও হয়ে থাকেন। তবে ভবিষ্যদ্বাণীসমূহের মূলভাষ্য বা শব্দাবলী নিঃসন্দেহে সর্বোচ্চ পর্যায়ে পরম সত্য হয়ে থাকে। কিন্তু নবীগণের স্বভাবসূলভ এ রীতি হয়ে থাকে যে কখনও ইজতিহাদের ধারায় নিজ পক্ষ থেকে সেগুলোর কিছু পরিমাণ 'তফসির' বা ব্যাখ্যা করে থাকেন। আর তাঁরা মানব বিধায় উক্ত তফসীর বা ব্যাখ্যায় কদাচিত ভুলের সম্ভবনা থাকে। কিন্তু, ঈমান ও দ্বীনি বিধান মূলক বিষয়াদিতে ভুল-চুক হওয়ার কোন সম্ভাবনা থাকে না। কেননা সেগুলোর উত্তমভাবে পৌঁছে দেয়ার ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌ তা'লার পক্ষ থেকে একান্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা থাকে এবং সে বিষয়াদি নবীগণকে 'আমলি' বা কার্যকরীভাবেও শিখিয়ে দেয়া হয়। অতএব, যেমন আমাদের নবী (সা.)-কে বেহেশ্‌ত ও দোযখও (ঐশীধারায়) প্রত্যক্ষ করানো হয় এবং পরম্পরা অকাট্য ও উজ্জ্বল আয়াত ও দলিল-প্রমাণ দ্বারা জান্নাত ও নরকের মূল তত্ত্ব ও প্রকৃত স্বরূপও প্রকাশিত করা হয়। অতএব উল্লেখিত তাঁদের এ 'তফসীর' ও ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে কী করেই-বা ভুল-চুক করতেন!? ভুলের সম্ভবনা কেবল এরূপ ভবিষ্যদ্বাণীর ক্ষেত্রে হয়ে থাকে যেগুলো আল্লাহ্‌ স্বয়ং কোনো কল্যাণ ও প্রজ্ঞামূলক কারণে অস্পষ্ট, প্রচ্ছন্ন বা সংক্ষিপ্তাকার রাখতে চান। দ্বীনি বিষয়াদির সঙ্গে সেগুলো একেবারে সম্পৃক্ত নয়। উল্লেখিত এ বিষয়টি এক গভীর সূক্ষ্ম-তত্ত্ব যা নবুওতের পদমর্যাদা সম্পর্কিত সহীহ্‌ মারেফত বা সূক্ষ্ম-জ্ঞান-তত্ত্ব লাভের কারণ হয়। এবং কোনো পূর্ব দৃষ্টান্ত ছাড়া ইবনে-মরিয়ম, দাজ্জাল ও সত্তর হাত লম্বা তার গাধার আসল অবস্থার বিস্তারিত বিবরণ যদি মহানবী (সা.)-এর প্রতি উন্মোচিত না হয়ে থাকে এবং ইয়াজুজ-মাজুজ ও দাব্বাতুল আরয্‌-এর প্রকৃতস্বরূপ যথাযথভাবে প্রকাশিত করা না-ও হয়ে থাকে এবং কেবল মানবীয় ক্ষমতার আওতায় যতটুকু সম্ভব ততটুকুই সম্ভাব্য উদাহরণ ইত্যাদির মাধ্যমে মোটামোটি পর্যায়ে বুঝানো হয়ে থাকে তাহলে তাতে বিস্মিত হওয়ার কোনো কারণ নেই। এরূপ বিষয়াদির ক্ষেত্রে– এগুলো প্রকাশকালে যদি এর কিছু অজানা খুটি-নাটি তথ্য প্রকাশিত হয় তবে তাতে নবুওয়াতের শান বা মর্যাদায় কোনো আপত্তি আসতে পারে না। কিন্তু পবিত্র কুরআন ও হাদীসে গভীর দৃষ্টিপাতে অবশ্যই অতি সুষ্ঠুভাবে প্রমাণিত হয় যে, আমাদের মনিব ও অভিভাবক (সা.) সন্দেহাতীত এবং একেবারে নিশ্চিতরূপে উপলব্ধি করেছিলেন যে, আল্লাহ্‌র নবী ইঞ্জিল-বাহক ঈসা-ইবনে-মরিয়ম কখনও দুনিয়ায় ফিরে আসবেন না। বরং তার নামের একজন আল্লাহ্‌ প্রেরিত ব্যক্তি আগমন করবেন, যিনি (পারস্পরিক) আধ্যাত্মিক সাদৃশ্যের কারণে তাঁর নাম খোদা তা'লার পক্ষ থেকে লাভ করবেন।

(৪) আর এ অধমের মাঝে প্রতিশ্রুত মসীহ্‌ হওয়ার যে-সব আলামত ও চিহ্ন বিদ্যমান সেগুলো হল সেই সব বৈশিষ্ট্যপূর্ণ 'খিদমত' বা মহতী সেবামূলক অবদান যা হযরত মসীহ্‌-ইবনে-মরিয়মের অনুরূপ ধারায় এ অধমের ওপর সমর্পণ করা হয়েছে। কেননা, হযরত মসীহ্‌ ইহুদীদের মাঝে সেই সময় এসেছিলেন যখন ইহুদীদের মাঝ থেকে তৌরাতের মগজরূপ সারবস্তু তিরোহিত হয়েছিল। আর ঐ যুগটি ছিল হযরত মূসা থেকে চৌদ্দশ' বছর পর, যখন হযরত মসীহ্‌-ইবনে-মরিয়ম ইহুদীদের সংশোধনার্থে প্রেরিত হয়েছিলেন। অতএব, অনুরূপ যুগে এ অধমও এসেছে, যখন কুরআন করীমের মগজরূপ সারবস্তু মুসলমানদের হৃদয় থেকে তিরোহিত এবং যুগটিও হযরত মূসা-সদৃশ মহানবী (সা.) থেকে হযরত মূসা ও ঈসার মাঝে ব্যবধান-কালের প্রায় সমান। *(চলবে)*

ভাষান্তর:
মওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ
মুরব্বী সিলসিলাহ্‌ (অবঃ)

"আহমদী" পত্রিকায় লেখা পাঠানো প্রসঙ্গে

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের একমাত্র মুখপত্র "আহমদী" পত্রিকায় লেখা পাঠানো প্রসঙ্গে এ দিক-নির্দেশনা দেয়া যাচ্ছে যে, এখন থেকে যারাই এতে লেখা ও সংবাদ পাঠাতে ইচ্ছুক, তারা এ পত্রিকার প্রকাশক বরাবর নিম্ন ঠিকানায় পাঠাবেন।

বরাবর– **আলহাজ্ব মাহবুব হোসেন,**
প্রকাশক, পাক্ষিক আহমদী
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ।
৪নং বকশীবাজার রোড, ঢাকা-১২১১।
e-mail: pakkhikahmadi.bd1922@gmail.com

লন্ডনের মর্ডেনস্থ বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন
হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) প্রদত্ত
১২ এপ্রিল ২০১৯, মোতাবেক ১২ শাহাদত, ১৩৯৮ হিজরী শামসী'র

জুমুআর খুতবা

মহানবী (সা.)-এর সাহাবী (রা.)-'গণের পুণ্যময় স্মৃতিচারণ

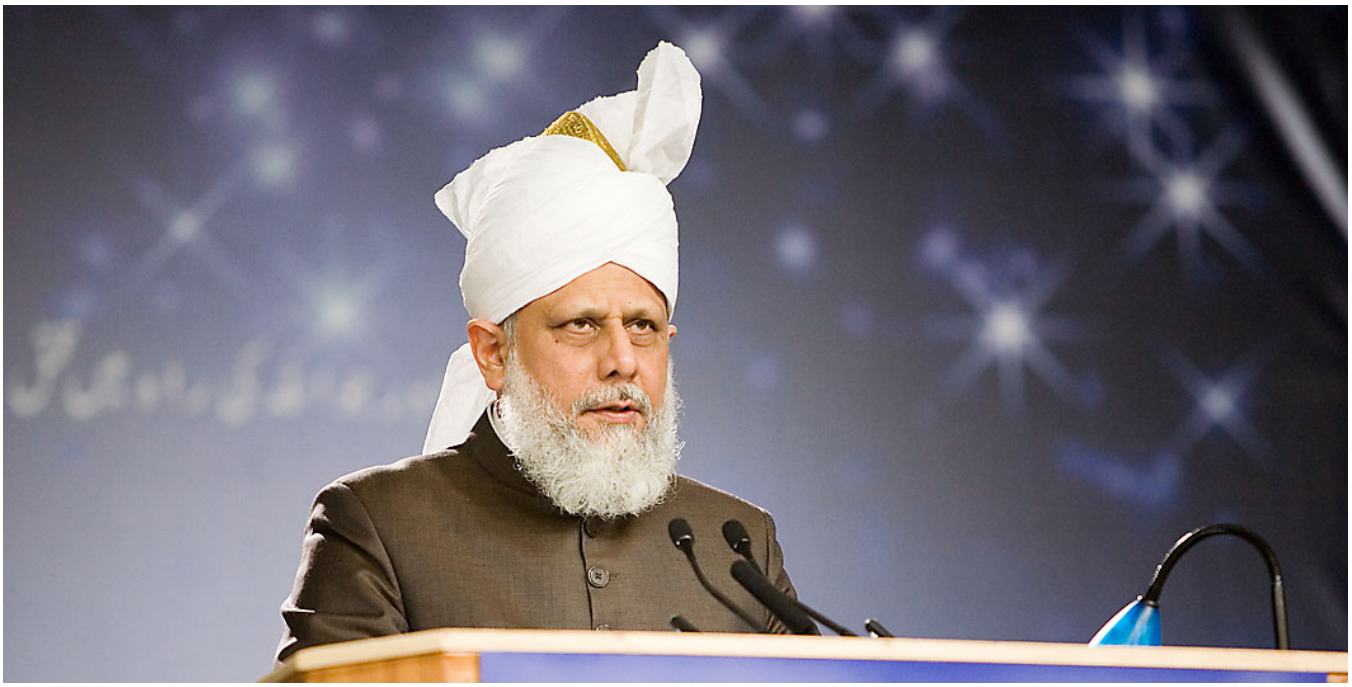

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ،
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۝ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝

তাশাহ্হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

আজকে আমি যেসব বদরী সাহাবীর স্মৃতিচারণ করব তাদের মাঝে সর্বপ্রথম নাম হলো হযরত হোসাইন বিন হারেস (রা.)। হযরত হোসাইনের মা ছিলেন সুখায়লা বিনতে খুযাঈ। তিনি ছিলেন বনু মুত্তালেব বিন আবদে মানাফ গোত্রের সদস্য। তিনি তার দুই ভাই হযরত তোফায়েল এবং হযরত উবায়দার সাথে মদীনায় হিযরত করেন। তাদের সাথে হযরত মিসতা বিন উসাসা (রা.) এবং হযরত আব্বাদ বিন মুত্তালিব (রা.)ও ছিলেন। মদীনায় তিনি হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন সালামা আজলানী (রা.)-এর বাড়িতে অবস্থান করেন। রেওয়ায়েত অনুসারে মহানবী (সা.) হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন জুবায়ের (রা.)-এর সাথে হযরত হোসাইন (রা.)-এর ভ্রাতৃত্ববন্ধন স্থাপন করেছিলেন। এটি মুহাম্মদ বিন ইসহাকের ভাষ্য। হযরত হোসাইন বদর এবং ওহুদসহ সকল যুদ্ধে মহানবী (সা.)-এর সাথে অংশগ্রহণ করেছেন। হযরত হোসাইন (রা.)-এর দুই সহোদর হযরত উবায়দা (রা.) এবং হযরত তোফায়েল (রা.)ও বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। হযরত হোসাইন এর মৃত্যু হয়েছে ৩২ হিজরীতে। *(আত্তাবাকুতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩০ 'হোসাইন বিন হারেস' দারু এহইয়ায়ুত তারাসুল আরাবি, বৈরুতে মুদ্রিত ১৯৯৬) (আল ইসতিয়াব, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৪১, 'উবায়দা বিন হারেস' দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুতে মুদ্রিত ২০০২) (উসদুল গাবা, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৭৩, ' হোসাইন ইবনুল হারেস', দারুল কুতুল ইলমিয়া, বৈরুত)*

হযরত হোসাইন (রা.)-এর পুত্রের নাম ছিল আব্দুল্লাহ্। তার দুই কন্যা ছিলেন- খাদিজা এবং হিন্দ আর তারাও ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। খায়বারের যুদ্ধের সময় মহানবী (সা.) তাদের উভয়কে ১০০

'ওসাক' খাদ্যশস্য প্রদান করেছিলেন। *(আত্তাবাকুতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩০ 'যিকরুল হোসাইন বিন হারেস'; ৮ম খণ্ড, পৃ. ৩৬৪, তাসমিয়াতুন নিসায়ুল মাবায়াত মিন কুরাইশিন, দারু আহইয়ায়ুত তারাসুল আরাবি, বৈরুতে মুদ্রিত ১৯৯৬)*

এক 'ওসাক' ৬০ 'সা'-এর সমান হয়ে থাকে আর এক 'সা' আড়াই সের-এর সমপরিমাণ বা কিছুটা কম হয়ে থাকে। অতএব এভাবে তাদের পিতার কারণে মহানবী (সা.) তাদেরকে প্রায় ৩৭৫ মন খাদ্যশস্য প্রদান করেছিলেন। *(লুগাতুল হাদীস, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪৮৭, 'ওসাক'; ২য় খণ্ড পৃ. ৬৪৮ 'সা' নাশের নো'মানী কুতুবখানা লাহোর ২০০৫)*

হযরত সাফওয়ান (রা.), তার পিতার নাম ছিল ওহাব বিন রাবিআ। ইনি হলেন দ্বিতীয় সাহাবী যার আমি স্মৃতিচারণ করব। হযরত সাফওয়ানের ডাকনাম ছিল আবু আমর। তিনি বনু হারেস বিন ফেহের গোত্রের সাথে সম্পর্ক রাখতেন সদস্য ছিলেন। তার পিতার নাম ছিল ওহাব বিন রাবিআ। অপর একটি রেওয়ায়েতে তার নাম ওহায়েবও বর্ণিত হয়েছে। তার মায়ের নাম ছিল দাআদ বিনতে জাহ্‌দাম, যিনি বায়যা নামে পরিচিত ছিলেন। এ কারণেই হযরত সাফওয়ান (রা.)কে ইবনে বায়যাও বলা হতো। তিনি হযরত সাহাল (রা.) এবং সোহায়েল (রা.)-এর ভাই ছিলেন। মহানবী (সা.) যে সাহাল (রা.) এবং সোহায়েল (রা.)-এর কাছ থেকে মসজিদে নববীর ভূমি ক্রয় করেছিলেন তারা এই দুই ভাই নন। তারা ছিলেন অন্য দুজন। মহানবী (সা.) হযরত রাফে বিন মুআল্লা (রা.)-এর সাথে হযরত সাফওয়ান (রা.)-এর ভ্রাতৃত্ববন্ধন স্থাপন করেছিলেন। অন্য আরেকটি রেওয়ায়েত অনুসারে হযরত সাফওয়ান (রা.)-এর ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করা হয়েছিল হযরত রাফে বিন আজলান (রা.) সাথে। তাঁর মৃত্যু সম্পর্কেও ভিন্ন ভিন্ন মত রয়েছে। কেউ কেউ বলে যে, বদরের যুদ্ধে তোআয়মা বিন আদী হযরত সাফওয়ান (রা.)-কে শহীদ করেছিল কিন্তু অন্য আরেকটি রেওয়ায়েত অনুসারে তিনি বদরের যুদ্ধে শহীদ হন নি, বরং তিনি বদরের যুদ্ধসহ সকল যুদ্ধে মহানবী (সা.)-এর সাথে অংশগ্রহণ করেছেন। হযরত সাফওয়ান (রা.) সম্পর্কে একটি রেওয়ায়েতে এসেছে যে, বদরের যুদ্ধের পর তিনি মক্কা ফিরে গিয়েছিলেন। কিছুকাল পর তিনি পুনরায় মদীনায় হিযরত করে চলে আসেন। মক্কা বিজয় পর্যন্ত তিনি মক্কায়ই অবস্থান করেছেন বলেও রেওয়ায়েত বিদ্যমান রয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) তাকে আব্দুল্লাহ্ বিন জাহশা (রা.)-এর যুদ্ধাভিযানে অন্তর্ভুক্ত করে 'আবওয়া' অভিমুখে প্রেরণ করেছিলেন। কোন কোন রেওয়ায়েতে তার মৃত্যুর সন ১৮ বা ৩০ কিংবা ৩৮ হিজরী উল্লেখ করা হয়েছে। *(উসদুল গাবা, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৩, 'সাফওয়ান বিন ওহাব', দারুল কুতুল ইলমিয়া, বৈরুত) (আল ইসবা ফি তামযীযিস সাহাবা, সাহাবা ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৫৮-৩৫৯, সাফওয়ান বিন ওহাব, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুতে মুদ্রিত ১৯৯৫) (আত্তাবাকুতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩১৮ 'সাফওয়ান বিন বায়যা' দারুল কুতুল ইলমিয়া, বৈরুতে মুদ্রিত ১৯৯০)*

যাহোক, সব ক্ষেত্রেই এটি প্রমাণিত যে, তিনি (রা.) বদরী সাহাবী ছিলেন।

পরবর্তী সাহাবী যার স্মৃতিচারণ হবে তিনি হলেন, হযরত মুবাশ্বের বিন আব্দুল মুনযের (রা.)। হযরত মুবাশ্বের (রা.)-এর পিতার নাম ছিল আব্দুল মুনযের আর তাঁর মাতার নাম ছিল নসীবা বিনতে যায়েদ। তিনি অউস গোত্রের বনু আমর বিন অউফ শাখার সদস্য ছিলেন। মহানবী (সা.) হযরত মুবাশ্বের বিন আব্দুল মুনযের (রা.) এবং হযরত আকেল বিন আবু বুকায়ের (রা.)-এর মাঝে ভ্রাতৃত্ববন্ধন স্থাপন করেছিলেন। কেউ কেউ বলেন, তিনি (সা.) হযরত আকেল বিন আবু বুকায়ের (রা.) এবং হযরত মুজাযযার বিন যিয়াদ (রা.)-এর মাঝে ভ্রাতৃত্ববন্ধন স্থাপন করেছিলেন। যাহোক তিনি বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন আর সেই যুদ্ধেই তিনি শাহাদত বরণ করেন। হযরত মুবাশ্বের (রা.)-এর ভাই এবং হযরত আবু লুবাবা (রা.)-এর পুত্র হযরত সায়েব বিন আবু লুবাবা (রা.)-এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী (সা.) গনিমতের মালে হযরত মুবাশ্বের বিন আব্দুল মুনযের (রা.)-এর অংশ নির্ধারণ করেন আর মাআন বিন আদী (রা.) তার অংশ আমাদের কাছে নিয়ে আসেন। *(আত্তাবাকুতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৪৭-২৪৮, মুবাশ্বের বিন আব্দুল মুনযের, দারু এহইয়ায়ুত তারাসুল আরাবি, বৈরুতে মুদ্রিত ১৯৯৬)*

অর্থাৎ তাঁর ভাই এবং ভ্রাতুষ্পুত্ররাও অংশ পেয়েছে।

মদীনায় হিজরতের সময় মুহাজেরদের মধ্য থেকে হযরত আবু সালামা বিন আব্দুল আসাদ (রা.), হযরত আমের বিন রাবিআ (রা.), হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন জাহাশ (রা.) এবং তাঁর ভাই হযরত আবু আহমদ বিন জাহাশ (রা.) কুবায় হযরত মুবাশ্বের বিন আব্দুল মুনযের (রা.) বাড়িতে অবস্থান করেন। এরপর মুহাজেরগণ একের পর এক সেখানে আসতে থাকেন। *(আস্ সীরাতুন্নাবুওয়্যা লে ইবনে হিশাম, পৃ. ৩৩৫, যিকরুল মুহাযিরীন ইলাল মাদীনাতে, দারুল ইলমিয়া, বৈরুতে মুদ্রিত ২০০১)*

হযরত মুবাশ্বের বিন আব্দুল মুনযের (রা.) তাঁর দুই ভাই হযরত আবু লুবাবা বিন আব্দুল মুনযের (রা.) এবং হযরত রিফা বিন আব্দুল মুনযের (রা.)-এর সাথে বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। হযরত রিফা (রা.) ৭০জন আনসারের সাথে আকাবার বয়আতে অংশগ্রহণ করেন। একইভাবে বদর এবং ওহুদের যুদ্ধেও তিনি অংশগ্রহণ করেছেন। তিনি (রা.) ওহুদের যুদ্ধে শহীদ হন। বদরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করার সময় মহানবী (সা.) হযরত আবু লুবাবা (রা.)-কে মদীনার আমীর নিযুক্ত করে রওহা নামক স্থান থেকে ফেরত পাঠান। যেভাবে পূর্বেই বলা হয়েছে রওহা মদীনা থেকে ৪০ মাইল দূরে অবস্থিত একটি জায়গার নাম। কিন্তু মহানবী (সা.) তার জন্য গনিমতের মাল এবং পুণ্যে অংশ নির্ধারণ করেছেন। আল্লামা ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেন, হযরত মুবাশ্বের বিন আব্দুল

মুনযের (রা.) বনু আমর বিন অউফ গোত্রের লোক ছিলেন। তিনি সেসব আনসারী সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যারা বদরের যুদ্ধে শাহাদত বরণ করেছেন। *(উসদুল গাবা ফি মা'রেফাতিস সাহাবা, ৫ম খণ্ড, মুবাশ্বের বিন আব্দিল মুনযের, পৃ. ৫৩, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, ২০০৮ সনে বৈরুতে মুদ্রিত) (আত্তাবাকুতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৪১ মুবাশ্বের বিন আব্দিল মুনযের, দারু এহইয়ায়ুত তারাসুল আরাবি, ১৯৯৬সনে বৈরুতে মুদ্রিত) (লুগাতুল হাদীস, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৪৯)*

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আমর বিন হারাম (রা.) বর্ণনা করেন, ওহুদের যুদ্ধের পূর্বে আমি স্বপ্ন দেখলাম, হযরত মুবাশ্বের বিন আব্দুল মুনযের (রা.) আমাকে বলছেন, কিছুদিনের মধ্যেই তুমি আমাদের কাছে চলে আসবে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কোথায়? তিনি বললেন, আমি জান্নাতে। আমরা জান্নাতের যেখানে ইচ্ছা পানাহার করি। তখন আমি তাকে বললাম, আপনি কি বদরের যুদ্ধে শাহাদত বরণ করেন নি? তিনি বললেন, হ্যা! কেন নয়? কিন্তু আমাকে পুনর্জীবিত করা হয়েছে। এই সাহাবী মহানবী (সা.)-কে এই স্বপ্নের কথা শুনালে তিনি (সা.) বলেন, হে আবু জাবের! শাহাদত এমনই হয়ে থাকে। *(আল মুস্তাদরেক আলাস্ সাহীহায়েন, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১৮৪০-১৮৪১, কিতাব মা'রেফাতুস সাহাবা, যিকরু মানাকেবে আব্দিল্লাহিবনে আমর, মাকতুবা নাযারা মোস্তফা আল বায, মক্কা ২০০০)*

(অর্থাৎ) একজন শহীদ আল্লাহ্‌র কাছে যায় এবং সেখানে স্বাধীনভাবে বিচরণ করে।

আল্লামা যারকানি বদরের যুদ্ধে শাহাদাত বরণকারী সাহাবীদের উল্লেখ করতে গিয়ে লিখেন, অওস গোত্রের দু'জন সাহাবী ছিলেন, যাদের একজন ছিলেন হযরত সা'দ বিন খায়সামা (রা.)। কেউ কেউ বলে, তুআয়মা বিন আদী তাকে শহীদ করেছে আবার কারো কারো মতে, আমর বিন আবদে উদ্দ তাকে শহীদ করেছিল। সামহুদী তার বই 'ওফা'-তে লিখেছেন যে, জীবনিগ্রন্থ রচয়িতাদের লেখা থেকে স্পষ্ট যে, হযরত উবায়দা (রা.) ছাড়া বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবীরা বদরেই সমাহিত রয়েছেন। হযরত উবায়দা (রা.)'র মৃত্যু কিছুকাল পর হয়েছিল আর তিনি 'সাফরা' বা 'রওহা' নামক স্থানে সমাহিত রয়েছেন।

তিবরানী নির্ভরযোগ্য সূত্রে বর্ণনা করেন, হযরত ইবনে মাসঊদ (রা.) থেকে বর্ণিত, "নিশ্চয় মহানবী (সা.)-এর সেসব সাহাবী, বদরের যুদ্ধে যাদের শহীদ করা হয়েছে, আল্লাহ্ তাদের আত্মাকে জান্নাতে সবুজ পাখিদের মাঝে স্থান দেবেন, তারা জান্নাতে পানাহার করবে। এমতাবস্থায় তাদের প্রভু তাদের সামনে অকস্মাৎ আত্মপ্রকাশ করবেন এবং বলবেন, হে আমার বান্দাগণ! তোমরা কী চাও? তারা বলবে, হে আমাদের প্রভু! এর চেয়েও মহান কিছু আছে কী? আমরা তো জান্নাতে এসে গেছি। আল্লাহ্ তা'লা পুনরায় জিজ্ঞেস করবেন, তোমরা কী প্রত্যাশা কর? প্রত্যুত্তরে চতুর্থবার সাহাবীরা বলবেন, তুমি আমাদের আত্মাকে আমাদের দেহে ফিরিয়ে দাও, যেন আমাদেরকে পুনরায় সেভাবেই শহীদ করা হয় যেভাবে পূর্বে আমাদের শহীদ করা হয়েছিল।" *(বৈরুত থেকে ১৯৯৬ সনে প্রকাশিত শরাহ্ আল্লামা যারকানী, ২য় খণ্ড পৃ: ৩২৭)*

পরবর্তী যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হবে তার নাম হল, হযরত ওরাকাহ্ বিন ইয়াস (রা.)। হযরত ওরাকাহ্ (রা.)'র নাম নিয়ে মতভেদ রয়েছে। তার নাম ওরাকাহ্ ছাড়া 'ওয়াদফাহ্' এবং 'ওয়াদকাহ্'-ও বর্ণিত হয়েছে। হযরত ওরাকাহ্ (রা.)'র পিতার নাম ছিল, ইয়াস বিন আমর। তিনি আনসারদের খাযরাজ গোত্রের বনু লাওযান বিন গানাম শাখার সদস্য ছিলেন। আল্লামা ইবনে ইসহাকের বর্ণনা অনুসারে হযরত ওরাকাহ্ (রা.) তার দু'ভাই হযরত 'রবী' এবং হযরত 'আমর' এর সাথে বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণের তৌফিক লাভ করেছিলেন। হযরত ওরাকাহ্ (রা.) বদরের যুদ্ধ ছাড়াও ওহুদ, খন্দক এবং অন্যান্য সকল যুদ্ধে মহানবী (সা.)-এর সাথে অংশগ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেছেন। ইয়ামামার যুদ্ধে হযরত আবু বকর (রা.)'র খিলাফতকালে একাদশ হিজরীতে তিনি শাহাদত বরণ করেন। *(বৈরুত থেকে ২০০১ সনে প্রকাশিত সীরাত ইবনে হিশাম, পৃ: ৪৬৯) (বৈরুত থেকে ২০০৮ সনে প্রকাশিত আসদুল গাবাহ্, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৪১২-৪১৩)*

পরবর্তী যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হচ্ছে তার নাম হল, হযরত মুহরেয বিন নাযলাহ্ (রা.)। নাযলাহ্ বিন আব্দুল্লাহ্ হলেন তার পিতা। যদিও অপর এক বর্ণনা অনুযায়ী তার পিতার নাম ছিল ওহাব। তার ডাকনাম ছিল আবু নাযলাহ্। তিনি ফর্সা এবং সুশ্রী চেহারার অধিকারী ছিলেন। তার উপাধি ছিল ফুহায়রা। তিনি আখরাম নামেও সুপরিচিত ছিলেন। তিনি বনু আবদে শামস এর মিত্র ছিলেন। যদিও বনু আব্দুল আশহাল তাকে নিজেদের মিত্র বলে দাবী করে। অর্থাৎ মুহরেয অথবা আখরাম, দু'টি নামই তার ছিল।

হযরত মুহরেয (রা.) মক্কার বনু গানাম বিন দূদান গোত্রের সদস্য ছিলেন। এই গোত্রটি মুসলমান হয়ে গিয়েছিল। এর পুরুষ এবং মহিলারা মদিনায় হিজরতের তৌফিক লাভ করে। এই মুহাজেরদের মাঝে হযরত মুহরেয বিন নাযলাও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ওয়াক্‌দী বলেন, আমি ইব্রাহীম বিন ইসমাঈলকে বলতে শুনেছি যে, ইয়াওমুস্ সারহা-য়, এটি যী কারদ এবং গাবা'র যুদ্ধের নাম, যা ষষ্ঠ হিজরীতে সংঘটিত হয়েছিল, হযরত মুহরেয বিন নাযলা (রা.) ব্যাতিরেকে বনু আব্দিল আশহাল এর ঘর থেকে আর কেউ বের হয়নি। তিনি হযরত মুহাম্মদ বিন মুসলেমা (রা.)-এর ঘোড়ায় আরোহিত ছিলেন, যার নাম ছিল 'যুল্ লাম্মা'। মহানবী (সা.) হযরত মুহরেয বিন নাযলা (রা.) এবং হযরত উমারা বিন হায্‌ম (রা.)-এর মাঝে ভ্রাতৃত্ববন্ধন স্থাপন করেছিলেন। ওয়াক্‌দী-র মতে তিনি বদর, উহুদ এবং পরিখার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। সালেহ্ বিন কায়সান কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত মুহরেয বিন নাযলা (রা.) বলেন, আমি স্বপ্নে

নিম্ন-আকাশকে দেখি যে, তা আমার জন্য খুলে দেয়া হয়েছে। এক পর্যায়ে আমি তাতে প্রবেশ করি আর সপ্তম আকাশ পর্যন্ত পৌঁছে যাই। এরপর সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত চলে যাই। আমাকে বলা হয়, এটি হলো তোমার গন্তব্য। হযরত মুহরেয (রা.) বলেন, আমি হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-এর কাছে এই স্বপ্ন বর্ণনা করি, যিনি স্বপ্নের ব্যাখ্যায় পারদর্শী ছিলেন। তখন তিনি বলেন, শাহাদাতের শুভসংবাদ গ্রহণ কর! এরপর একদিন তাকে (রা.) শহীদ করা হয়। তিনি মহানবী (সা.) এর সাথে ইয়ামুস সারহা-য় গাবা'র যুদ্ধের জন্য যাত্রা করেন। এটিকে যী কার্‌দ-এর যুদ্ধও বলা হতো, যা ষষ্ঠ হিজরী সনে সংঘটিত হয়। আমর বিন উসমান জাহ্‌শী নিজ পিতৃপুরুষদের পক্ষ থেকে বর্ণনা করেন যে, হযরত মুহরেয বিন নাযলা (রা.) যখন বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন তখন তার বয়স ৩১ বা ৩২ বছর ছিল, আর তিনি যখন শহীদ হন তখন তার বয়স প্রায় ৩৭ বা ৩৮ বছরের কাছাকাছি ছিল। *(আত্ তাবাকাতুল কুবরা, খণ্ড: ০৩, পৃ: ৫২, মুহরেয বিন নাযলা, দ্বার আহইয়াউত্ তুরাছ, বৈরুত থেকে ১৯৯৬ সনে প্রকাশিত সংস্করণ) (উসদুল গাবা ফী মা'রেফাতিস্ সাহাবা, খণ্ড: ০৫, পৃ: ৬৮, মুহরেয বিন নাযলা, দ্বারুল কুতুবুল আলামিয়্যা, বৈরুত, লেবানন থেকে ২০০৮ সনে প্রকাশিত সংস্করণ)*

হযরত মুহরেয (রা.)-এর শাহাদাতের ঘটনা এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত আয়াস বিন সালামা (রা.) যী কার্‌দ এর যুদ্ধ সম্পর্কে বলেন, আমার পিতা আমাকে বলেছেন, হুদায়বিয়ার সন্ধির ঘটনার পর আমরা মদিনায় ফিরে যাওয়ার জন্য যাত্রা করি। অতঃপর আমরা এক স্থানে যাত্রাবিরতি দেই। আমাদের এবং বনু লেহইয়ান এর মাঝে একটি পাহাড় ছিল। তারা মুশরিক ছিল। এরপর মহানবী (সা.) সেই ব্যক্তির জন্য দোয়া করেন যে রাতে এই পাহাড়ে চড়বে, অর্থাৎ সে যেন মহানবী (সা.) এবং সাহাবীদের জন্য পরিস্থিতির প্রতি দৃষ্টি রাখা এবং সুরক্ষার উদ্দেশ্যে গুপ্তচরের কাজ করে। মোটকথা নিগরানী ও নিরাপত্তার জন্য যেন ওপড়ে চড়ে আর দৃষ্টি রাখে যে, কোথাও শত্রুরা হামলা না করে বসে। হযরত সালামা বিন আকওয়া (রা.) বলেন, আমি সেই রাতে দুই বা তিনবার পাহাড়ে চড়ি। এরপর আমরা মদিনায় পৌঁছি। তিনি বলেন, এরপর মহানবী (সা.) রাবাহ্ নামের ব্যক্তির হাতে নিজের উট প্রেরণ করেন, যে মহানবী (সা.) এর দাস ছিল। আর আমি হযরত তালহার ঘোড়া নিয়ে তাতে চড়ে বের হই। আমি সেটিকে উটের সাথে পানি পান করানোর জন্য যাচ্ছিলাম। সকাল হলে আব্দুর রহমান ফাযারি মহানবী (সা.) এর উটের ওপর আক্রমণ করে। তার সাথে একটি শত্রু গোত্র ছিল। তারা সব উট হাকিয়ে নিয়ে যায় এবং সেগুলোর রাখালকে হত্যা করে। বর্ণনাকারী বলেন, আমি বললাম- হে রাবাহ্! এই ঘোড়া নাও আর এটিকে তালহা বিন উবায়দুল্লাহ্'র কাছে পৌঁছে দাও। আর মহানবী (সা.)-এর কাছে এই সংবাদ পৌঁছাও যে, মুশরিকরা আপনার পশু লুট করে নিয়ে গেছে। এরপর আমি মদিনার দিকে মুখ করে একটি টিলার ওপর দাঁড়াই আর তিনবার ডাকি- ইয়া সাবাহাহু! ইয়া সাবাহাহু! এই বাক্য আরবরা তখন বলতো যখন কোন ছিনতাইকারী ও হত্যাকারী শত্রু সকালে আসতো। তখন (মানুষ) উক্ত শব্দে নারাহ্ উত্তোলন করতো যেন উচ্চ স্বরে সাহায্য চাওয়া হচ্ছে এবং সহযোগিতার জন্য ঘোষণা করা হচ্ছে, যাতে নিজ পক্ষের লোকেরা তৎক্ষণাৎ এসে শত্রুর মোকাবিলা করে আর তাদেরকে তাড়িয়ে দেয়।

কেউ কেউ বলেছেন, যোদ্ধাদের রীতি ছিল, রাত হতেই তারা যুদ্ধ বন্ধ করে দিত এবং নিজেদের ঠিকানায় ফিরে যেত, সাবাহাহু সম্পর্কে এটিও আরেকটি রেওয়ায়েত, আর সাবাহাহু বলে পরের দিন যোদ্ধাদের অবহিত করা হতো যে, সকাল হয়ে গেছে, অতএব পুনরায় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে যাও। লুগাতুল হাদীস গ্রন্থে এই ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে। যাহোক, তিনি বলেন, এরপর আমি তাদের পিছনে সন্ধান করতে করতে এবং তাদেরকে তির মারতে মারতে বের হই, আর আমি রণসঙ্গীত পাঠ করছিলাম এবং বলছিলাম যে,

আনা ইবনুল আকওয়া, ওয়াল ইয়াওমু ইয়াওমুর্ রুয্‌যা

অর্থাৎ আমি আকওয়ার পুত্র আর এই দিনটি হীন ব্যক্তিদের ধ্বংসের দিন। অতএব আমি তাদের মাঝ থেকে যাকেই পেতাম তার হাওদায় তির মারতাম, এমনকি তিরের ফলা বের হয়ে তার কাঁধ পর্যন্ত পৌঁছে যেত। আমি বলতাম, এই নাও, আনা ইবনুল আকওয়া, ওয়াল ইয়াওমু ইয়াওমুর রুয্‌যা। অর্থাৎ আমি আকওয়ার পুত্র আর এই দিনটি হীন ব্যক্তিদের ধ্বংসের দিন। তিনি বলেন, খোদার কসম! আমি তাদের তির মারতে থাকি এবং তাদের আহত করতে থাকি। আর যখন আমার দিকে কোন অশ্বারোহী আসতো তখন আমি কোন গাছের ছায়ায় এসে তার নীচে বসে পড়তাম, অর্থাৎ গাছের পিছনে লুকিয়ে পড়তাম। আর আমি তাকে তির মেরে আহত করে দিতাম। এমনকি যখন পাহাড়ী পথ সরু হয়ে যায় আর তারা সেই সরু পথে প্রবেশ করে তখন আমি পাহাড়ে আরোহন করি আর তাদের দিকে পাথর ছুঁড়তে থাকি। অর্থাৎ এরা যারা মহানবী (সা.)-এর পশুপাল লুট করে নিয়ে যাচ্ছিল, তাদের ওপর তিনি আক্রমণ করেন। তিনি একা ছিলেন। প্রথমে তিনি তির মারতে থাকেন, এরপর বলেন যে, গিরিপথে পৌঁছে সেখান থেকে পাথর নিক্ষেপ আরম্ভ করি। এভাবেই আমি তাদের পিছু ধাওয়া করতে থাকি, এমনকি আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.)-এর উটগুলোর মাঝ থেকে এমন কোন উট রাখেন নি যেটিকে আমি নিজের পেছনে না ফেলে দেই, অর্থাৎ গিরিপথের কারণে সেগুলো পেছনে রয়ে যায় আর তারা দৌড়ে সামনে চলে যায়। তারা সেগুলোকে আমার ও তাদের মাঝখানে ছেড়ে দেয়। এরপর আমি তির নিক্ষেপ অব্যাহত রাখি। এমনকি তারা ত্রিশটির অধিক চাদর এবং ত্রিশটি বর্শা ওজন হালকা করার উদ্দেশ্যে ফেলে দেয়। অর্থাৎ তারা যেহেতু দৌড়াচ্ছিল তাই উট ছেড়ে

দিয়েছিল এবং এরপর নিজেদের জিনিসপত্রও পেছনে ফেলে দিতে আরম্ভ করে যেন সহজে দৌড়াতে পারে। তিনি বলেন, তারা যে জিনিসই ফেলে যেতো, আমি সেগুলোর ওপর চিহ্ন হিসেবে পাথর রেখে দিতাম যেন মহানবী (সা.) এবং তাঁর সাহাবীরা তা চিনতে পারেন। এমনকি তারা একটি সংকীর্ণ উপত্যকায় পৌঁছে, যেখানে তারা বদর ফাযারি'র কোন পুত্রকে পায়। তারা সেখানে বসে খাদ্য গ্রহণ আরম্ভ করে আর আমি একটি চূড়ায় বসেছিলাম। ফাযারি বলে যে, এই ব্যক্তি কে, যাকে আমি দেখতে পাচ্ছি? তারা বলে, এই ব্যক্তি আমাদেরকে অতিষ্ঠ করে তুলেছে। খোদার কসম! সে সকাল থেকে অনবরত আমাদের ওপর তির নিক্ষেপ করে যাচ্ছে, এমনকি সে আমাদের কাছ থেকে সবকিছু ছিনিয়ে নিয়েছে। সে বলে যে, তোমাদের মাঝ থেকে চার ব্যক্তির তার দিকে যাওয়া উচিত। হযরত সালামা বিন আকওয়া (রা.) বলেন, তাদের মাঝ থেকে চারজন আমার উদ্দেশ্যে পাহাড়ে চড়ে। তারা যখন আমার এতটা নিকটবর্তী হয় যে, আমি তাদের সাথে কথা বলতে পারি তখন আমি তাদের বলি, তোমরা কি আমার সম্পর্কে জান? তারা বলে যে, না, তুমি কে? আমি বললাম যে, আমি সালামা বিন আকওয়া। এরপর তিনি সেই কাফেরদের বলেন যে, তাঁর কসম, যিনি মুহাম্মদ (সা.) এর পবিত্র চেহারাকে সম্মানিত করেছেন, আমি তোমাদের মাঝ থেকে যাকে ইচ্ছা ধরতে পারি, কিন্তু তোমাদের মাঝ থেকে কেউ যদি আমাকে পাকড়াও করতে চায় তাহলে সে তা করতে পারবে না। এতে যে চারজন এসেছিল তাদের একজন কিছুটা ভয় পেয়ে যায় এবং বলে যে, আমারও একই ধারণা। এরপর তারা চারজনই ফিরে যায় আর আমি আমার নিজের স্থানে বসে থাকি। এমনকি আমি মহানবী (সা.) এর ঘোড়াগুলোকে গাছপালার মাঝ দিয়ে আসতে দেখি। তাদের মাঝে সর্বপ্রথম ছিলেন আখরাম আসাদী আর তার পিছনে ছিলেন আবু কাতাদা আনসারী (রা.)। আর তার পিছনে ছিলেন মিকদাদ বিন আসওয়াদ কিন্দি (রা.)। আমি আখরাম অর্থাৎ হযরত মুহরেয (রা.)-এর ঘোড়ার লাগাম ধরি। তখন তারা পিঠ ফিরিয়ে চতুর্দিকে পালিয়ে যায়। এখানে কিছুটা অস্পষ্টতা রয়েছে। আমার মনে হয়, সেখানে বসে অন্য যারা খাবার খাচ্ছিল, যখন তারা দেখে যে, তিনি আরো নিকটবর্তী হয়ে গেছেন তখন তারাও পিঠ দেখিয়ে পালিয়ে যায়। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আখরাম, অর্থাৎ মুহরেযকে বলেন যে, যতক্ষণ মহানবী (সা.) ও তাঁর সাহাবীগণ না পৌঁছেন, তুমি আত্মরক্ষা কর যেন তারা তোমাকে হত্যা না করতে পারে। তিনি বলেন, হে সালমা! যদি তুমি আল্লাহ্ তা'লা এবং শেষ দিবসে ঈমান রাখ আর তুমি যদি জান্নাত, অগ্নি তথা জাহান্নাম সত্য বলে জানো, তাহলে তুমি আমার এবং শাহাদতের মাঝে প্রতিবন্ধক হইও না। অতএব আমি তাকে ছেড়ে দেই। এমনকি তিনি অর্থাৎ আখরাম (রা.) এবং আব্দুর রহমান পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হন এবং তিনি আব্দুর রহমানসহ তার ঘোড়াকে আহত করেন। আব্দুর রহমান তাকে অর্থাৎ আখরাম বা হযরত মুহরেয (রা.)-কে বর্শা মেরে শহীদ করে দেয় এবং তার ঘোড়ায় আরোহন করে নিজ লোকদের মাঝে ফিরে যেতে উদ্যত হয়। তখন মহানবী (সা.) এর সাথে যারা আসছিল তাদের মাঝ থেকে একজন অর্থাৎ মহানবীর দক্ষ অশ্বারোহী আবু কাতাদা (রা.) আব্দুর রহমানের পিছু ধাওয়া করেন, এবং তাকে ধরে ফেলেন আর বর্শা মেরে তাকে হত্যা করেন। এ ব্যক্তি হযরত মুহরেয (রা.)-কে শহীদ করেছিল। তিনি বলেন, সেই মহান সত্তার কসম যিনি মুহাম্মদ (সা.) এর পবিত্র চেহারাকে সম্মানিত করেছেন! আমি দৌড়ানো অবস্থায় তাদের পিছু ধাওয়া করতে থাকি আর তাদের পিছুধাওয়া অব্যাহত রাখি। এমনকি আমি মুহাম্মদ (সা.) এর সাহাবীদের মাঝ থেকে কাউকে বরং তাদের ধূলাকেও নিজের পিছনে দেখতে পাই। অর্থাৎ তিনি অনেকটা অগ্রসর হয়ে গিয়েছিলেন। এমনকি সূর্যাস্তের পূর্বে তারা একটি উপত্যকায় পৌঁছে যেখানে একটি ঝর্ণা ছিল। সেটিকে যী কারদ বলা হতো। অর্থাৎ সেসব লোক, যারা মাল ছিনতাই করে নিয়ে যাচ্ছিল, তারা সেখান থেকে পানি পান করতে চাচ্ছিল, কেননা তারা পিপাসার্ত ছিল। এরপর তারা আমাকে তাদের পেছনে দৌড়াতে দেখতে পায়। আমি তাদেরকে সেখান থেকে তাড়িয়ে দেই এবং তারা সেখান থেকে এক ফোঁটাও পান করতে পারে নি। তারা সেখান থেকে বের হয়ে অপর একটি উপত্যকার দিকে দ্রুত অগ্রসর হয়। আমিও পশ্চাদ্ধাবন করি। আমি তাদের মাঝ থেকে যাকেই পিছনে পেতাম, অর্থাৎ লুকিয়ে লুকিয়ে পেছনে দৌড়াতে থাকি। আর যে-ই পেছনে রয়ে যেত তার কাঁধের হাড়ে তির মারতাম। আমি বলতাম, এই নাও, **আনা ইবনুল আকওয়া', ওয়াল ইয়াওমু ইয়াওমুর রুযযা'।**

অর্থাৎ আমি আকওয়ার পুত্র আর এ দিনটি নীচ বা হীন ব্যক্তিদের ধ্বংসের দিন। তিনি বলেন, সে বলে যে, আকওয়া লাঞ্ছিত হোক, সকালের আকওয়ার কথা বলছো? অর্থাৎ তিনি যাদেরকে আহত করছিলেন তাদের মাঝ থেকে একজন বলে যে, সেই প্রভাতের আকওয়া যে প্রভাতকাল থেকে আমাদের পিছু ধাওয়া করছে? আমি বললাম যে, হ্যাঁ, হে নিজ প্রাণের শত্রু! তোমার সেই প্রভাতের আকওয়া। তারা দুটি ঘোড়া উপত্যকায় নিজেদের পেছনে ছেড়ে যায়। আমি সেগুলোকে হাকিয়ে মহানবী (সা.) এর কাছে যাওয়ার জন্য যাত্রা করি। আমি আমেরকে একটি পানির মশকে কিছুটা পানি মিশ্রিত দুধ এবং একটি মশকে পানি নিয়ে আসতে দেখি। আমি ওযু করি এবং পান করি। অতঃপর আমি মহানবী (সা.) এর কাছে আসি, আর তিনি (সা.) তখন সেই ঝর্ণার কাছে ছিলেন যেখান থেকে আমি সকালে তাদের অর্থাৎ সেই ছিনতাইকারীদের তাড়িয়ে দিয়েছিলাম। মহানবী (সা.) সেই পানির কাছে পৌঁছে গিয়েছিলেন। আমি দেখলাম যে, মহানবী

(সা.) সেই উট এবং সমস্ত জিনিস যা আমি মুশরেকদের কাছ থেকে ছাড়িয়ে এনেছিলাম, গ্রহণ করেছেন। আমি যেসব উট তাদের হাত থেকে মুক্ত করেছিলাম হযরত বেলাল (রা.) সেই উটগুলোর মাঝ থেকে একটি উটনী জবাই করেন। তিনি মহানবী (সা.) এর জন্য কলিজা এবং কুঁজের মাংস নিয়ে ভুনা করছিলেন। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমাকে সৈন্যবাহিনী থেকে অর্থাৎ যারা আপনার সাথে এসেছে তাদের মধ্য থেকে ১০০ লোককে মনোনীত করার অনুমতি দিন। আমি তাদের পিছু ধাওয়া করে তাদের সবাইকে হত্যা করতে চাই, যেন তাদের গোত্রকে অবহিত করার মতো একজনও জীবিত না থাকে। অর্থাৎ যারা এই মালামাল ছিনতাই করে নিয়ে যাচ্ছিল তাদের কথা হচ্ছে। রসূলুল্লাহ্ (সা.) খিলখিলিয়ে হাসেন। এমনকি আগুনের আলোয় তাঁর (সা.) দাঁত মোবারক দেখা যেতে থাকে। তিনি (সা.) বলেন, হে সালামা! তুমি কি মনে কর যে, তুমি এটি করতে পারবে আর তাদের সবাইকে তাদের ঘরে পৌঁছার পূর্বেই হত্যা করতে পারবে? আমি বললাম, হ্যাঁ সেই মহান সত্তার কসম! যিনি আপনাকে সম্মানিত করেছেন। তিনি (সা.) বলেন, এখন তারা গাতফান এর সীমানায় পৌঁছে গেছে। অপর এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, এখানে এই শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে যে, হযরত সালামা বিন আকওয়া (রা.) মহানবী (সা.)-এর কাছে মুশরিকদের দ্বিতীয়বার পিছু ধাওয়া করার অনুমতি চাইলে মহানবী (সা.) বলেন, ইয়া ইবনাল আকওয়া, মালাকতা ফাসজে'। অর্থাৎ হে আকওয়ার পুত্র! তুমি যখন বিজয় লাভ করেছ, যেতে দাও এবং উপেক্ষা কর। এখন তাদের পিছু ধাওয়া করে এবং হত্যা করে কী লাভ? অতএব এই হলো উন্নত আদর্শ। প্রথমে তিনি একা যুদ্ধ করতে থাকেন, হযরত মুহরেয আসলে তার ওপর তারা গুপ্ত-হামলা করে এবং তাকে শহীদ করে। প্রথমে কোনভাবে তিনি তাদের ঘোড়াকে ধরে ফেলেন আর হামলা প্রতিহত করেন এবং বেঁচে যান। কিন্তু পুনরায় আক্রমণ হয় আর তিনি শহীদ হন। এটি হলো তার অর্থাৎ হযরত মুহরেয (রা.)-এর শাহাদতের ঘটনা। আর দ্বিতীয় বিষয় ছিল তার বীরত্ব। এছাড়া রণকৌশল সম্পর্কেও তিনি অভিজ্ঞ ছিলেন। অতি দক্ষতার সাথে ছিনতাইকারীদের কাছ থেকে সমস্ত মাল পুনরুদ্ধার করেন। এখানে গুরুত্বপূর্ণ কথা হলো ধনসম্পদ পুনরুদ্ধার করার পরও যখন তিনি বলেন যে, আমি পিছুধাওয়া করে তাদের সবাইকে হত্যা করব; তখন মহানবী (সা.) বলেন যে, তাদেরকে যেতে দাও। সম্পদ যেহেতু ফেরত পাওয়া গেছে তাই ছেড়ে দাও। অতএব এই হলো মহানবী (সা.) এর উন্নত আদর্শ, কেননা হত্যা বা খুন করা তাঁর (সা.) উদ্দেশ্য ছিল না। ছিনতাইকারী এবং আক্রমণকারীদের কাছ থেকে যখন তিনি সম্পদ পুনরুদ্ধার করেন আর তাদের সবাই নিজেদের সবকিছু ছেড়ে পালিয়ে যায়, তখন তাদের কেউ কেউ আহতও হয়, কিন্তু তিনি সেখানে কোন প্রকার যুদ্ধবিগ্রহ বা খুনখারাবি করেন নি।

যাহোক তিনি বলেন, মহানবী (সা.) যখন তাকে এসব কথা বলছিলেন যে, ছেড়ে দাও, যেতে দাও, তারা পালিয়ে গেছে, তখন বনি গাতফান এর এক ব্যক্তি আসে এবং বলে যে, অমুক ব্যক্তি তাদের জন্য উট জবাই করেছে। যখন সে উটের চামড়া ছাড়াচ্ছিল তখন সে ধূলা দেখতে পায় এবং বলে যে, তারা এসে গেছে। এরপর তারা সেখান থেকেও পালিয়ে যায়। প্রভাতে মহানবী (সা.) বলেন, আজ আমাদের সর্বোত্তম অশ্বারোহী হলেন আবু কাতাদা, আর পদাতিক সৈনিকদের মাঝে সর্বোত্তম হলেন সালামা। অর্থাৎ পদাতিক যোদ্ধাদের মাঝে সর্বোত্তম হলেন সালামা (রা.), যিনি তাদেরকে কঠিন পরিস্থিতির মাঝে ফেলে দিয়েছিলেন। তিনি বলেন, মহানবী (সা.) আমাকে দুটি অংশ দান করেছেন। একটি আরোহীর অপরটি পদাতিকের। এরপর মদিনা ফেরার পথে মহানবী (সা.) আমাকে আসবা উটনীর ওপর নিজের পেছনে বসান। তিনি বলেন, আমরা যখন যাচ্ছিলাম তখন আনসারের এক ব্যক্তি, যার চেয়ে দ্রুত কেউ দৌড়াতে পারত না, তিনি বলতে আরম্ভ করেন যে, মদিনা পর্যন্ত দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়ার কেউ আছে কি? যুদ্ধ এবং শত্রুদের নির্যাতন সত্ত্বেও সাহাবীরা নিজেদের বিনোদনের ব্যবস্থাও করে নিতেন। একে অপরকে হালকা চ্যালেঞ্জও করতেন যেন সময়ও কেটে যায় আর শত্রুদের পক্ষ থেকে যে, স্থায়ী মানসিক চাপ থাকে তা-ও কিছুটা প্রশমিত হয়। যাহোক তিনি বলেন যে, কেউ আছে কি যে আমার সাথে দৌড়বে? এমন কোন দৌড়বিদ আছে কি? তিনি বলেন, তিনি বারবার এই কথার পুনরাবৃত্তি করেন। আমি যখন এ কথা শুনি তখন আমি সেই দ্বিতীয় সাহাবীকে রসিকতা করে বলি যে, তুমি কি কোন সম্মানিত ব্যক্তির সম্মান কর না, কোন বুযুর্গকে ভয় কর না? সে বলে যে, মহানবী (সা.) ব্যতিরেকে আর কাউকে নয়। অর্থাৎ মহানবী (সা.) ছাড়া আর কাউকে আমি ভয় করি না। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমার পিতামাতা আপনার জন্য নিবেদিত। আমাকে এই ব্যক্তির সাথে দৌড় প্রতিযোগিতা করতে দিন। তিনি (সা.) বলেন, ঠিক আছে, তুমি যদি চাও তাহলে কর। তখন আমি সেই ব্যক্তিকে বলি, চল প্রতিযোগিতা করি। তিনি বলেন, এরপর আমি আমার পা ঘুরিয়ে লাফ দেই এবং দৌড় আরম্ভ করি। আমি এক বা দুই উপত্যকা তার পিছনে দৌড়াই। আমি নিজের শক্তি সঞ্চিত রাখছিলাম। এরপর আমি ধীরে ধীরে তার পিছনে দৌড়াতে থাকি। অতঃপর আমি গতি কিছুটা বাড়িয়ে দেই এবং তার কাছে পৌঁছে যাই। এভাবে দৌড় চলতে থাকে। দৌড়ের ক্ষেত্রে সে ছিল মদিনায় সবার চেয়ে দ্রুতগতি সম্পন্ন মানুষ। তিনি বলেন, আমি গতি আরো কিছুটা বাড়িয়ে দিয়ে তাকে ধরে ফেলি এবং তার কাঁধের মাঝামাঝি ঘুষি দেই। আমি বলি, আল্লাহ্‌র কসম, তুমি পেছনে রয়ে গেলে।

এক বর্ণনাকারী বলেন, আমার মনে হয় তিনি বলেছেন, আমি মদিনা পর্যন্ত তার সামনে ছিলাম। এরপর আমরা শুধুমাত্র তিন

রাত সেখানে অবস্থান করি। অতঃপর মহানবী (সা.) এর সাথে খায়বারের উদ্দেশ্যে যাত্রা করি। *(সহীহ মুসলিম, ৯ম খণ্ড, পৃ. ২২৮-২৩৮, কিতাবুল জিহাদ, হাদীস নং ৩৩৫৮, ২০০৮ সনে নূর ফাউণ্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত) (সহীহ বুখারী, কিতাবুল মাগাজি, বাব গাজওয়া যাতিল কারদ, হাদীস নং ৪১৯৪)*

অর্থাৎ সেখানে অবস্থানের পর খায়বারের উদ্দেশ্যে বের হন।

তাবরী'র ইতিহাসে এই যুদ্ধ সম্পর্কে কিছুটা বিস্তারিত এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত আসেম বিন আমর বিন কাতাদা থেকে বর্ণিত যে, যী কারদ এর যুদ্ধে শত্রুদের কাছে সবার আগে হযরত মুহরেয বিন নাযলার ঘোড়া পৌঁছে, যিনি বনু আসাদ বিন হুযায়মা গোত্রের সদস্য ছিলেন। হযরত মুহরেয বিন নাযলা (রা.)কে আখরামও বলা হতো। অনুরূপভাবে তাকে (রা.) কুমায়েরও বলা হতো। শত্রুদের পক্ষ থেকে যখন লুটপাট এবং বিপদের আশঙ্কায় সাহাবীদের একত্রিত হওয়ার ঘোষণা আসে তখন হযরত মাহমুদ বিন মাসলামা (রা.)-এর ঘোড়া, যা তার বাগানে বাঁধা ছিল, অন্যান্য ঘোড়ার হ্রেষাধ্বনি অর্থাৎ ডাক শুনতে পায় এবং নিজের জায়গায় লাফালাফি আরম্ভ করে। এটি একটি উৎকৃষ্ট এবং প্রশিক্ষিত ঘোড়া ছিল। তখন বনু আব্দুল আশআল এর মহিলাদের মাঝ থেকে কতিপয় মহিলা এই বাঁধা ঘোড়াকে এভাবে লাফাতে দেখে হযরত মুহরেয বিন নাযলাকে বলে যে, হে কুমায়ের! আপনার কি নিজের এই ঘোড়ায় আরোহনের সামর্থ্য আছে? আর এই ঘোড়া কেমন তা আপনি দেখতেই পাচ্ছেন। এরপর তিনি গিয়ে মুসলমান এবং মহানবী (সা.)-এর সাথে মিলিত হন। তিনি বলেন, হ্যাঁ আমি প্রস্তুত আছি। এরপর মহিলারা সেই ঘোড়াটি তার (রা.) হাতে সোপর্দ করে। তিনি (রা.) অর্থাৎ হযরত মুহরেয তাতে আরোহন করে যাত্রা করেন। তিনি এই ঘোড়ার লাগাম ঢিল ছেড়ে দেন। এমনকি তিনি সেই দলের সাথে মিলিত হন যা মহানবী (সা.) এর সাথে যাচ্ছিল এবং তিনি তাদের সামনে দাঁড়িয়ে যান। এরপর হযরত মুহরেয বিন নাযলা বলেন, হে ছোট্ট দল! থাম, যতক্ষণ না অন্যান্য মুহাজের এবং আনসার তোমাদের সাথে মিলিত হয়, যারা তোমাদের পিছনে রয়েছে। বর্ণনাকারী বলেন, শত্রুদের এক ব্যক্তি তার ওপর আক্রমণ করে এবং তাকে শহীদ করে। এরপর সেই ঘোড়া অনিয়ন্ত্রিত হয়ে ছুটতে থাকে এবং কেউ সেটিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে নি। এমনকি সেটি বনু আব্দুল আশআল এর মহল্লায় এসে সেই রশির কাছেই দাঁড়িয়ে যায় যা দিয়ে সেটিকে বেঁধে রাখা হয়েছিল। অতএব সেদিন তিনি ছাড়া মুসলমানদের আর কেউ শহীদ হয় নি। আর হযরত মাহমুদ (রা.) সহীহ্ মুসলিমের [তাবকাত ইবনে সা'দ এর বর্ণনা অনুযায়ী সেই সাহাবীর নাম ছিল হযরত মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রা.)।] আর তার ঘোড়ার নাম ছিল যুল লাম্মা'। অপর এক বর্ণনা অনুযায়ী হযরত মুহরেয বিন নাযলা শাহাদতের সময় হযরত উকাশা বিন মিহসান (রা.) এর ঘোড়ায় আরোহিত ছিলেন, সেই ঘোড়াকে জানাহ্ বলা হতো, এবং শত্রুদের কাছ থেকে কিছু পশু ছাড়িয়ে এনেছিলেন। মহানবী (সা.) নিজের স্থান থেকে যাত্রা করেন এবং যী কারদ এর পাহাড় পর্যন্ত পৌঁছে বিরতি দেন। সেখানেই অন্য সাহাবীরা মহানবী (সা.)-এর কাছে এসে উপস্থিত হন। মহানবী (সা.) এক দিন এবং এক রাত সেখানে অবস্থান করেন। সালামা বিন আকওয়া (রা.) মহানবী (সা.)-এর কাছে নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনি যদি একশত ব্যক্তিকে আমার সাথে প্রেরণ করেন তাহলে আমি বাকি পশুগুলোও শত্রুদের কাছ থেকে ছাড়িয়ে আনছি এবং তাদের ঘাঁড় চেপে ধরছি। মহানবী (সা.) বলেন, কোথায় যাবে? এখন তো তারা গাতফান এর মদ পান করছে। মহানবী (সা.) নিজ সাহাবীদেরকে প্রতি দলে এক এক শ' করে বিভিন্ন দলে ভাগ করে তাদের মাঝে খাবারের জন্য উট বণ্টন করেন, যেগুলোকে সাহাবীরা খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করে। এরপর মহানবী (সা.) মদিনায় ফিরে আসেন। *(তারিখুল তিবরী, ৩য় খণ্ড, গাজওয়া যি কারদ, পৃ. ১১৫-১১৬, ২০০২ সনে প্রকাশিত) (আত তাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৭০, মুহরেয বিন নাযলাহ, ১৯৯০ সনে বৈরুতে মুদ্রিত)*

আর তাদের কাছ থেকে কোন ধরণের প্রতিশোধ গ্রহণ করেন নি। তাদেরকে ছেড়ে দেন বা তাদেরকে যেতে দেন। সেখানে কেবল হযরত মুহরেয (রা.)ই শহীদ হন। এক বর্ণনা অনুযায়ী তিনি অশ্বারোহীদের মাঝে সর্বপ্রথম শহীদ ছিলেন। আর প্রথম বর্ণনায়ও এ কথা-ই বলা হয়েছে।

এরপর যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হচ্ছে তার নাম হলো, হযরত সোয়াইবিত বিন সা'দ (রা.)। তাকে (রা.) সোয়াইবিত বিন হারমালাও বলা হয়। তার নাম সোয়াইত বিন হারমালা এবং সালীত বিন হারমালাও বর্ণনা করা হয়েছে। হযরত সোয়াইবিত (রা.) ছিলেন বনু আবদে দার গোত্রের সদস্য। তাঁর মায়ের নাম ছিল হুনায়দা। তিনি প্রথমদিকে ইসলাম গ্রহণকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। অধিকাংশ জীবনী লেখকগণ তাকে (রা.) ইথিওপিয়ায় হিযরতকারীদের মধ্যে গণ্য করেছেন। *(উসদুলগাবা ফী মা'রেফাতিস সাহাবা, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৫৪, সোয়াইবিত বিন হারমালা, ২০০৩ সনে বৈরুতে মুদ্রিত) (আল ইসাবাহ ফী তাময়ীযিস সাহাবা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৩৬৮, নুয়ায়মান বিন আমর, ২০০৫ সনে বৈরুতে মুদ্রিত) (তারিখে দামেস্ক আল কাবীর লে ইবনে আসকার, ১২তম খণ্ডের ২৪তম অংশ, পৃ. ১১৭, বৈরুতে মুদ্রিত)*

হযরত সোয়াইবিত (রা.) মদিনায় হিযরত করেন আর হিজরতের পর তিনি আব্দুল্লাহ্ বিন সালামা আজলানী (রা.)এর গৃহে অবস্থান করেন। মহানবী (সা.) হযরত সোয়াইবিত (রা.) এবং হযরত আয়েয বিন মায়েস (রা.)-এর মাঝে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন স্থাপন করেছেন। হযরত সোয়াইবিত (রা.) বদর এবং ওহুদের যুদ্ধেও যোগদান করেছিলেন। *(আত তাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৬৫, সোয়াইবিত বিন সা'দ, ১৯৯৬ সনে বৈরুতে মুদ্রিত)*

হযরত উম্মে সালমা (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.)-এর তিরোধানের এক বছর পূর্বে হযরত আবু বকর (রা.) সিরিয়ার একটি অঞ্চল 'বুসরা'য় বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে গিয়েছিলেন। তার সাথে নুয়ায়মান (রা.) এবং সোয়াইবিত বিন হারমালা (রা.)ও সফর করেন আর তাদের উভয়েই বদরের যুদ্ধেও যোগদান করেছিলেন। নুয়ায়মান (রা.) পাথেয় বা রসদের দায়িত্বে নিযুক্ত ছিলেন। সোয়াইবিত (রা.) রসিক প্রকৃতির ছিলেন। তিনি নুয়ায়মান (রা.)-কে বলেন, আমাকে খাবার খাওয়াও, রশদ বা খাদ্য সামগ্রী ছিল নুয়ায়মানের তত্ত্বাবধানে, কাফেলার পুরো খাবার-দাবার আয়োজনের দায়িত্ব ছিল তার ওপর। সোয়াইবিত (রা.) তাকে বলেন, খাবার খাওয়াও। এতে তিনি বলেন, আবু বকর (রা.) যতক্ষণ না আসবেন, আমি খাবার দেবো না। তখন সোয়াইবিত (রা.) বলেন, তুমি আমাকে খাবার না দিলে আমি তোমাকে ক্রোধান্বিত করব। [হুযূর (আই.) বলেন] পূর্বেও আমি সংক্ষেপে এই ঘটনা বর্ণনা করেছিলাম। যাত্রাকালে তারা যখন একটি গোত্রের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন হযরত সোয়াইবিত (রা.) তাদেরকে বলেন, তোমরা কি আমার কাছ থেকে আমার এক কৃতদাসকে ক্রয় করবে? তারা উত্তরে বলে, হ্যাঁ। সোয়াইবিত (রা.) সেই গোত্রের লোকদের বলেন, স্মরণ রেখ! এই কৃতদাস বেশি কথা বলে, আর সে একথাই বলতে থাকবে যে, আমি স্বাধীন। সে তোমাদেরকে এই কথা বললে তাকে ছেড়ে দিয়ে আমার ব্যবসা খারাপ করো না। তারা উত্তর দেয় যে, না, বরং আমরা তাকে তোমার কাছ থেকে কিনতে চাই। তখন তারা দশ উটের বিনিময়ে সেই কৃতদাসকে কিনে নেয়। এরপর তারা হযরত নুয়ায়মান এর কাছে আসে এবং তার গলায় পাগড়ি বা রশি পরায়। নুয়ায়মান বলেন, এই ব্যক্তি তোমাদের সাথে ঠাট্টা করছে। আমি স্বাধীন, কৃতদাস নই। কিন্তু তারা উত্তর দেয় যে, সে তোমার সম্পর্কে পূর্বেই আমাদের বলে দিয়েছিল যে, তুমি আমাদেরকে একথাই বলবে, এরপর তারা (তাকে) ধরে নিয়ে যায়। হযরত আবু বকর (রা.) যখন ফিরে আসেন আর লোকেরা তার সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করেন তখন তিনি ঐ লোকদের পেছনে পেছনে যান আর তাদেরকে তাদের উটগুলো ফেরত দিয়ে নুয়ায়মানকে ফিরিয়ে নিয়ে আসেন, আর বলেন, ইনি অর্থাৎ নুয়ায়মান কৃতদাস নন বরং স্বাধীন, উনি অর্থাৎ সোয়াইবিত ঠাট্টা করেছিল। সাহাবীদের মধ্যে এ ধরনের হাসি-ঠাট্টার রীতিও ছিল। যাহোক, এরা যখন ফিরে এসে মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হয় এবং তাঁকে (সা.) এ ঘটনা বলেন। বর্ণনাকারী বলেন, তখন মহানবী (সা.) এবং তাঁর সাহাবীরা এক বছর পর্যন্ত এ ঘটনা উপভোগ করেন। *(সুনান ইবনে মাজা, কিতাবুল আদাব, বাব আল মাজা, হাদীস নং ৩৭১৯) (মু'জামুল বিলদান, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫২২, বৈরুতে মুদ্রিত)*

এ কথা শুনে মহানবী (সা.)-ও খুব হাসেন। এক বছর পর্যন্ত এই কৌতুকটি জনপ্রিয় ছিল। যাহোক, একটি ব্যতিক্রমসহ উপরোক্ত ঘটনা কোন কোন গ্রন্থে এভাবেও বর্ণিত হয়েছে যে, বিক্রেতা হযরত সোআয়বিত নন বরং হযরত নোয়ায়মান ছিলেন।

সাহাবীদের স্মৃতিচারণের পর আমি সংক্ষেপে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর একটি এলহাম "ওয়াস্‌সে মাকানাকা" (অর্থাৎ তুমি তোমার গৃহ সম্প্রসারিত কর) সম্পর্কে কিছু কথা বলতে চাই। এই এলহাম বিভিন্ন সময়ে তাঁর (আ.) প্রতি হয়েছে। তিনি (আ.) বলেন, শুরুতে আল্লাহ্ তা'লা "ওয়াস্‌সে মাকানাকা"র এলহাম সেই সময় করেন যখন সম্ভবত দুই-তিনজন লোকই আমার বৈঠকে আসতো, এছাড়া কেউ আমাকে চিনতো না। *(সিরাজে মুনীর, রূহানী খাযায়েন ১২শ খণ্ড, পৃ. ৭৩)*

এরপর বিভিন্ন সময়ে অন্যান্য এলহামের সাথেও "ওয়াস্‌সে মাকানাকা" এলহামটি হতে থাকে। অর্থাৎ নিজের গৃহ বা আবাসন সম্প্রসারণ কর। এর সাথে অন্যান্য যে এলহাম হয়েছে তাতে বিভিন্ন সুসংবাদ এবং বিভিন্নভাবে আল্লাহ্‌র কৃপারাজি বর্ষিত হওয়ারও উল্লেখ রয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা যখন নিজ নবীদের এলহামের মাধ্যমে কোন নির্দেশ প্রদান করেন যে, এটি কর, তখন এর অর্থ হয় আল্লাহ্ তা'লা এর জন্য সাহায্য ও সহযোগিতাও করবেন আর উপকরণেরও ব্যবস্থা করবেন, এভাবে একাজ সম্পন্ন হবে আর এটিই আমাদের অভিজ্ঞতা। জামা'তের ইতিহাস আমাদের বলে যে, কত মহিমার সাথে আল্লাহ্ তা'লা এই এলহাম পূর্ণ করেছেন আর এখনও পূর্ণ করছেন। আমরা যারা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর তুচ্ছ দাস, আমাদেরকেও বিভিন্ন সময়ে এই এলহাম পূর্ণ হওয়ার দৃশ্য দেখিয়ে যাচ্ছেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতিটি এলহাম এবং কোন বিষয়ে আল্লাহ্ তা'লা কর্তৃক তাঁকে নির্দেশ প্রদান অথবা ভবিষ্যদ্বাণীর আদলে কোন কিছু অবহিত করা মূলত তাঁর মাধ্যমে মহানবী (সা.)-এর ধর্ম অর্থাৎ ইসলামের প্রচার এবং উন্নতির সুসংবাদ আর তাঁর তিরোধানের পর খিলাফত ব্যবস্থার মাধ্যমে মহানবী (সা.)-এর বাণীকে বিশ্বময় বিস্তারের সুসংবাদ বটে। অতএব অগ্রপানে আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপ অথবা যে উন্নতি আমরা দেখি তা মূলত আল্লাহ্ তা'লার সেই পরিকল্পনারই অংশ যা আল্লাহ্ তা'লা জগৎময় ইসলামের প্রচারের জন্য হাতে নিয়েছেন।

এই ভূমিকার পর আমি পুনরায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর এলহাম "ওয়াস্‌সে মাকানাকা" (অর্থাৎ তুমি তোমার গৃহকে সম্প্রসারিত কর)-এর দিকে আসছি। এখানে অর্থাৎ যুক্তরাজ্যে খিলাফতের হিজরতের পর, যুক্তরাজ্যে, ইউরোপে, আমেরিকায়, আফ্রিকায় এবং বিশ্বের অন্যান্য দেশে জামা'তের প্রসারের পাশাপাশি জামাতের কেন্দ্র ও স্থাপনা বৃদ্ধি পেতে থাকে। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে বিভিন্ন জায়গা প্রদান করতে থাকেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে যখন এখানে হিযরত করে এসেছিলেন তখন আল্লাহ্ তা'লা তাৎক্ষণিক ও অসাধারণভাবে স্বীয় প্রাচুর্যের নিদর্শন দেখান আর জামা'ত ইসলামাদে ২৫ একর জমি ক্রয় করার তৌফিক লাভ করে। এরপর এতে আরো ৬ একর যুক্ত হয়, যেখানে (দীর্ঘদিন) জলসাও হতে থাকে আর

জামা'তের কর্মচারী এবং ওয়াকেফীনদের জন্য কিছু বাসস্থানেরও সুবিধা ছিল। খলীফাতুল মসীহ্‌র বাসস্থানের জন্য একটি বাংলোও ছিল, কয়েকটি অফিসও ছিল। ব্যারাকরূপী একটি জায়গা ছিল যেখানে মসজিদও বানানো হয়েছিল। আমার স্মরণ আছে, একবার ১৯৮৫ সনে আমি যখন এখানে এসেছিলাম তখন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) আমাকে বিশেষভাবে বলেছিলেন যে, "কেন্দ্রের জন্য আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে খুবই চমৎকার একটি জায়গা দান করেছেন"। হুবহু এই বাক্য না হলেও মোটামুটি শব্দমালা এমনই ছিল। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এবং অন্যান্য কিছু স্বাক্ষ্যপ্রমাণও এর সত্যায়ন করে যে, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)'র এখানে যথারীতি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার সংকল্প ছিল। যাহোক, প্রতিটি কাজের জন্য আল্লাহ্ তা'লা একটি সময় নির্ধারণ করে রেখেছেন। এখন আল্লাহ্ তা'লা ইসলামাবাদে নতুন স্থাপনা নির্মাণের তৌফিক দিয়েছেন। উত্তম সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত কয়েকটি অফিস বানানো হয়েছে। আনুষ্ঠানিক বা রীতিমত মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে। যুগ খলীফার জন্য বাসস্থান নির্মাণ করা হয়েছে। ওয়াকেফে যিন্দেগী ও কর্মচারীদের জন্যও কিছু গৃহ নির্মিত হয়েছে, আরও কিছু নির্মিত হবে।

লণ্ডনে বাসগৃহ অফিসে রূপান্তরিত করে সাময়িকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছিল আর খুবই ছোট ছোট কক্ষে কষ্টে-সৃষ্টে কাজ হচ্ছিল। কাজের ব্যাপকতার কারণে জায়গা খুবই সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। এছাড়া কাউন্সিলও আপত্তি করতো যে, এসব গৃহ আবাসনের জন্য বানানো হয়েছে অথচ তোমরা অফিস বানিয়ে রেখেছ, এখান থেকে অফিস তুলে দাও। তাই স্বাভাবিকভাবেই প্রায়শ এ ধরনের দাবি উঠত। এখন এই নতুন স্থাপনা নির্মাণের ফলে এখানে (অর্থাৎ, মসজিদ ফযলের পাশে) বিভিন্ন বাড়িতে যে তিন-চারটি অফিস ছিল তা ইনশাআল্লাহ্ তা'লা ইসলামাবাদে স্থানান্তরিত হবে। অনুরূপভাবে ইসলাবাদের পাশেই ফার্নহামে একটি বেশ বড় দ্বিতল বিল্ডিংও আল্লাহ্ তা'লা জামা'তকে দান করেছেন যা ইসলামাবাদ থেকে ২/৩ মাইল দূরত্বে অবিস্থত, সেখানে প্রেস কাজ করছে, এছাড়া কয়েকটি অফিসও রয়েছে। এছাড়া এখানে খোদ্দামুল আহমদীয়াও বড় একটি বিল্ডিং ক্রয় করার সৌভাগ্য লাভ করেছে। সেই সাথে ইতিপূর্বে জলসাগাহের জন্য (ইসলামাবাদের) অদূরে দু'শতাধিক একরের হাদীকাতুল মাহদী ক্রয় করারও আল্লাহ্ তা'লা তৌফিক দিয়েছেন। এরপর লন্ডনে যে জামেয়া ছিল তা-ও এখান থেকে স্থানান্তরিত হয়েছে আর জামেয়ার বর্তমান জায়গা অকল্পনীয় কম মূল্যে এবং উত্তম পরিবেশে ও উন্নত সুযোগ-সুবিধাসজ্জিত অবস্থায় আল্লাহ্ তা'লা দান করেছেন। এ ভূমির মোট আয়তন হলো, প্রায় ৩০ একর। এসব জায়গা ইসলামাবাদ থেকে ১০ থেকে ২০ মিনিটের দূরত্বে অবস্থিত। ইসলামাবাদের বর্তমান প্রকল্পের সাথে এসব জায়গা ক্রয় করার কোন পূর্ব পরিকল্পনা ছিল না। এসবই আল্লাহ্ তা'লার পরিকল্পনা বা অভিপ্রায় ছিল। এই সকল জায়গা, এক এলাকায় কাছাকাছি, একত্র হতে থাকে আর আল্লাহ্ তা'লা কেন্দ্রের পাশাপাশি অন্যান্য জিনিসেরও ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। জামেয়াও (কেন্দ্রের) নিকটে থাকা আবশ্যক। দোয়া করুন, আল্লাহ্ তা'লা এসব জায়গা, এসব স্থাপনার এক এলাকায় একত্রিত হওয়া সকল অর্থে কল্যাণময় করুন।

আমি যেমনটি বলেছি, যুগ খলীফার বাসস্থান এবং অফিসও সেখানে ইতিমধ্যে নির্মিত হয়েছে। বড় মসজিদও নির্মিত হয়েছে। তাই এখন আমিও লণ্ডন থেকে কয়েকদিনের মধ্যে ইসলামাবাদে স্থানান্তরিত হবো, ইনশআল্লাহু তা'লা। সেখানে স্থানাতন্তর পরবর্তী অবস্থানও যেন সবদিক থেকে কল্যাণময় হয় সেজন্য দোয়া করুন। আল্লাহ্ তা'লা সর্বদা কৃপা করুন অনুগ্রহরাজী বর্ষণ করতে থাকুন। আল্লাহ্ তা'লা ইসলামাবাদ থেকে ইসলামের প্রচারের কাজকে পূর্বের তুলনায় আরো ব্যপকতা দান করুন। "ওয়াসসে মাকানাকা" কেবল গৃহায়নের ক্ষেত্রে বিস্তৃতির কারণ যেন না হয় বরং আল্লাহ্ তা'লার বিভিন্ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রেও যেন প্রসারতার মাধ্যম হয়। এখানে এটিও স্পষ্ট করে দিচ্ছি যে, মসজিদ ফযলের প্রতিবেশীদের মসজিদে আগমনকারী আহমদীদের কারণে এবং ট্রাফিক ও পার্কিং এর কারণে কষ্ট ও অভিযোগ ছিল। এজন্য নতুন জায়গায় (অর্থাৎ ইসলামাবাদে) নামাযের জন্য বা ইসলামাবাদে আগমনকারীদের জন্য প্রতিবেশী বা এলাকারবাসীর যেন কোনরূপ অভিযোগ না থাকে, তাদেরকে অভিযোগের সুযোগ দিবেন না। (ইসলামাবাদের) আশেপাশের লোকেরা আসবেন, ট্রাফিক আইন মেনে চলা আর সাবধানতার বিষয়টি সর্বদা দৃষ্টিগোচরে রাখুন।

জুমুআর নামাযের যতটুকু সম্পর্ক আছে আমি সচরাচর এখানে অর্থাৎ বায়তুল ফুতুহ্'তে এসে জুমুআর নামায পড়াবো। আমীর সাহেবকে আমি বলেছি, তিনি রীতিমত পরিকল্পনা করে জামাতসমূহকে জানিয়েও দিবেন যে, কারা বা কোন কোন জামা'ত ইসলামাবাদে জুমুআ পড়বেন বা কারা সেখানে জুমুআ পড়তে চান! সেখানকার পার্শ্ববর্তী জামা'তগুলোই হবে, তাদের মধ্য হতে যারাই পড়তে চাইবেন তারা সেখানে গিয়ে (নামায) পড়তে পারবেন। কোন্ কোন্ এলাকার লোক এর আওতাভুক্ত হবে আর এর বণ্টন কেমন হবে? ইসলামাবাদের ২০ মাইলের ভিতর বসবাসকারীরা সেখানেই সমবেত হতে পারেন এবং জুমুআ পড়তে পারেন। যাহোক, বিস্তারিত আমীর সাহেবের পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট জামা'তের প্রেসিডেন্টগণ পেয়ে যাবেন। ২০ মাইলের বাইরের যারা সেখানে জুমুআ পড়বে তাদের সম্পর্কেও জানা যাবে যে, সেগুলো কোন্ কোন্ জামা'ত অথবা কীভাবে তাদের বিন্যস্ত করা হবে। যাহোক, পুনরায় আমি একথাই বলবো, দোয়া করুন, আল্লাহ্ তা'লা যেন এই পরিকল্পনা এবং সেখানে স্থানান্তরকে সবদিক থেকে কল্যাণমণ্ডিত করেন।

কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত

বিশ্বময় শান্তির সুবাতাস প্রবাহিত হোক নতুন বছরের প্রত্যাশা

মাহমুদ আহমদ সুমন

সৃষ্টিকর্তার অপার কৃপায় আমরা নতুন বছরে প্রবেশ করেছি, আলহামদুলিল্লাহ। আমরা মুসলমানরা চান্দ্র বছরের মাধ্যমেও বছরের সূচনা করি, আর সৌর বছরের মাধ্যমেও আর এই চান্দ্র পঞ্জিকা শুধু মুসলমান নয় বরং পৃথিবীর অনেক জাতিতে প্রাচীন যুগে চান্দ্র পঞ্জিকার মাধ্যমেই বছর শুরু হতো। চীনা, হিন্দু এবং পৃথিবীর অনেক জাতিতে এই চান্দ্র পঞ্জিকার রীতি ছিল। ইসলামের পূর্বে আরবদের মাঝে দিনের হিসাব বা বছরের হিসাবের জন্য চান্দ্র পঞ্জিকার প্রচলন ছিল। আল্লাহ্‌পাক কোরআন করিমে ইরশাদ করেন: 'নিশ্চয়ই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টির দিন থেকেই আল্লাহ্‌র বিধানে আল্লাহ্‌র নিকট মাস গণনায় মাস বারোটি' *(সূরা তাওবা, আয়াত: ৩৬)*। আল্লাহ্ তা'লা আরো ঘোষণা করেন: 'তিনিই সূর্যকে তেজস্কর ও চন্দ্রকে জ্যোতির্ময় করেছেন এবং তাদের মঞ্জিল নির্দিষ্ট করেছেন, যাতে তোমরা বছর গণনা ও সময়ের হিসাব জানতে পারো। আল্লাহ্ এসব নিরর্থক সৃষ্টি করেন নি। জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য তিনি এ সমস্ত নিদর্শন বিশদভাবে বিবৃত করেন' *(সূরা ইউনুস, আয়াত: ৬)*।

সাধারণত দেখা যায় নতুন বছরকে স্বাগত জানাতে লোকেরা হৈ-হুল্লোড় ও ক্রীড়া-কৌতুক আর জাগতিক আনন্দ-উল্লাসের মাঝে সারা রাত কাটিয়ে দেয় আর এতে এমন কোন অপকর্ম নেই যা পাশ্চাত্যসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে না করা হয়। আমাদের নিজেদের কর্ম নিয়ে একটু তো চিন্তা করা উচিত যে, আমরা কি করছি? যেভাবে ইসলামী জাহানের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর (রা.) একবার মিম্বরে দাঁড়িয়ে তার খুতবায় এক ঐতিহাসিক উক্তি উপস্থাপন করেছিলেন, যা ইমাম তিরমিজি (রহ.) স্বীয় গ্রন্থ তিরমিজি শরিফ এবং ইমাম ইবনে আবি শায়বা (রহ.) স্বীয় গ্রন্থ মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বায় উল্লেখ করেন। হযরত ওমর (রা.) বলেছিলেন, 'হিসাব চাওয়ার আগে নিজের হিসাব করে নাও, তোমার কাজ পরিমাপ করার আগে নিজেই নিজের কাজের পরিমাপ করে নাও' *(জামে তিরমিজি)*।

অথচ আমরা এটি ভেবে দেখি না যে, জীবন থেকে একটি বছরের সমাপ্তি ঘটছে আর প্রবেশ করছি নতুন বছরে, যেখানে আমার করণীয় হল সৃষ্টিকর্তার দরবারে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, নিজের ভুলত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা, নতুন বছর যেন সর্বদিক থেকে মঙ্গলময় হয় সেই দোয়া করা। অথচ তা না করে আমরা সব ধরণের বৃথা কার্যকলাপ এবং অপকর্ম করে নতুন বছরকে স্বাগত জানাচ্ছি। নববর্ষের মতো সময়ের একটি এহেন গুরুত্বপূর্ণ পর্বে এমন কোনো কাজ করা সমীচীন হবে না, যা আমাদের আমলনামা বা জীবনপঞ্জিকে কলঙ্কিত করবে। হযরত আলী (রা.) বলেন: তুমি রাতের আঁধারে এমন কোনো কাজ কোরো না, যার কারণে তোমাকে দিনের আলোয় মুখ লুকাতে হবে।

আসলে আজ পৃথিবীর সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণির ধর্মের চোখ অন্ধ হয়ে গিয়েছে, তাই তাদের দৃষ্টি সেখানে পৌঁছা সম্ভব নয় যেখানে একজন মুমিনের দৃষ্টি পৌঁছে। একজন মুমিনের মহিমা হল এই সমস্ত বৃথা কার্যকলাপ এড়িয়ে চলা, বরং আত্মজিজ্ঞাসা করা যে, আমাদের জীবনে একটি বছর এসেছে এবং চলে গেছে, এই বছরটি আমাদের কী দিয়ে গেল বা কি নিয়ে গেল আর আমরা কি পেলাম আর কি হারালাম?

একজন মুমিন এটাই দেখবে যে, জাগতিক দৃষ্টিকোণ থেকে এ বছর সে কী হারিয়েছে আর কি পেয়েছে? তার জাগতিক অবস্থা বা বৈষয়িক অবস্থায় কি ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে। সে বিগত বছরে কি কি পুণ্যকর্ম করেছে আর এবছর যেন আরো বেশি পুণ্যকর্ম করতে পারে সেই চেষ্টায় সে নতুন বছরকে বরণ করবে তাহাজ্জুদ নামাজ এবং বিশেষ ইবাদত বন্দেগীর মাধ্যমে। আমাদের দুর্বলতার জন্য মহান আল্লাহ্‌পাকের দরবারে এই দোয়া করতে হবে, হে আল্লাহ্! আমাদের আগত বছর যেন বিগত বছরের ন্যায় আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে দুর্বল না হয় বরং আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপ, প্রতিটি দিন, প্রতিটি ক্ষণ ও পদচারণা যেন তোমার সন্তুষ্টির লক্ষ্যে হয়। আমাদের প্রতিটি দিন যেন বিশ্বনবী ও শ্রেষ্ঠনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর আদর্শে অতিবাহিত দিন হয়। আমরা যেন পবিত্র কোরআন এবং প্রকৃত ইসলামের শিক্ষানুসারে জীবন পরিচালনা করতে

পারি। এই দোয়া যদি আমাদের হয় আর আমরা যদি নববর্ষের সূচনায় আত্মজিজ্ঞাসা, আত্মবিশ্লেষণ করি তাহলে আমাদের পরিণতি অবশ্যই শুভ হবে।

হযরত ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর দাদা তার পিতাকে পারস্যের নওরোজের দিন অর্থাৎ নববর্ষের দিন হযরত আলী (রা.)-এর নিকট নিয়ে গিয়েছিলেন এবং কিছু হাদিয়া পেশ করেছিলেন। তখন হযরত আলী (রা.) বললেন, 'নওরোজুনা কুল্লা ইয়াওম' মুমিনের প্রতিটি দিনই তো নববর্ষ। অর্থাৎ মুমিন প্রতিদিনই তার আমলের হিসাব নিকাশ করবে এবং নবউদ্যমে আখেরাতের পাথেয় সংগ্রহ করবে। আমাদের বছর যদি শুরু হয় উত্তম কাজ দ্বারা আর আল্লাহ্‌পাকের কাছে কামনাও থাকে যে, সারা বছরই যেন আমাকে ভাল কাজের তৌফিক দান করেন তাহলে অবশ্যই আমার জীবন হবে শান্তি ও কল্যাণময়।

কীভাবে আমরা নতুন বছরকে স্বাগত জানাব এ বিষয়ে নিখিলবিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রাণপ্রিয় খলীফা হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) তার এক খুতবায় বলেন-

"দুনিয়ার মুসলিম বা অমুসলিম, যারাই হোক না কেন, তারা দিন, মাস এবং বছরকে জাগতিক হৈ হুল্লোড়, ক্রীড়া-কৌতুক আর জাগতিক আনন্দ উল্লাসের মাঝে কাটিয়ে দেয়। পহেলা জানুয়ারী তারিখে আরম্ভ হওয়া নববর্ষের সূচনাতে এ দুনিয়ার মানুষ হেন কোন কর্ম নেই, যা তারা করে না। পাশ্চাত্য বা উন্নত দেশে বিশেষভাবে আর পৃথিবীর অন্যান্য অংশেও ৩১ ডিসেম্বর এবং পহেলা জানুয়ারীর মধ্যবর্তী রাতে এমন কোন হৈ হুল্লোড় নেই, যা করা হয় না। মাঝ রাত পর্যন্ত বিশেষভাবে জাগা হয়। বরং হৈ হুল্লোড়, মদের আসর বসানো এবং গান-বাজনা করার জন্য মানুষ সারা রাত জাগ্রত থাকে। এক কথায় বিগত বছরের সমাপ্তিও বৃথা কার্যকলাপ ও অপকর্মের মাধ্যমে হয় এবং নতুন বছরের সূচনাও হয় বৃথা ও বাজে কার্যকলাপের মাধ্যমে। পৃথিবীর সংখ্যা গরিষ্ঠ মানুষের ধর্মের চোখ অন্ধ হয়ে গেছে। তাই তাদের দৃষ্টি সেখানে পৌঁছা সম্ভব নয়, যেখানে মু'মিনের দৃষ্টি পৌঁছে থাকে এবং পৌঁছা উচিত। একজন মু'মিনের মহিমা হল, সে শুধু এ সমস্ত বৃথা কার্যকলাপ এড়িয়েই চলবে না এবং এগুলোকে ন্যাক্কারজনকই মনে করবে না, বরং তার আত্মজিজ্ঞাসা করা উচিত যে, তার জীবনে একটি বছর এসেছে এবং চলেও গেছে, এ বছরটি আমাদের কী দিয়ে গেল আর কী নিয়ে গেল এবং এ বছরে আমরা কী পেলাম আর কী হারালাম? একজন মু'মিনকে জাগতিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে হবে, এ বছরে সে কী হারিয়েছে আর কী পেয়েছে? তার জাগতিক বা বৈষয়িক অবস্থায় ইতিবাচক কী পরিবর্তন এসেছে অথবা তাকে ধর্মীয় এবং আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে হবে, কী হারালো আর কী পেল? আর যদি ধর্মীয় এবং আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে হয়, তাহলে কোন মাপকাঠিতে যাচাই করলে সে বুঝতে পারবে, কী হারালো আর কী পেল?

আমরা আহমদীরা সেই সব সৌভাগ্যবানের অন্তর্ভূক্ত যাদেরকে আল্লাহ্ তা'লা সেই মসীহ্ মওউদ এবং প্রতিশ্রুত মাহদীকে মানার তৌফিক দিয়েছেন, যিনি আমাদের সামনে আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের শিক্ষার সার এবং নির্যাস উপস্থাপন করেছেন আর আমাদেরকে বলেছেন, তোমরা যদি এই মাপকাঠিকে সামনে রাখ, তাহলে তোমরা জানতে পারবে যে, তোমরা কি তোমাদের জীবনের লক্ষ্য অর্জন করেছ বা অর্জনের চেষ্টা করেছ? এই মাপকাঠিকে সামনে রাখলেই তোমরা সত্যিকার মু'মিন গণ্য হিসেবে হবে। এই শর্তগুলো অনুসরণ করলে নিজেদের ঈমানকে সঠিকভাবে যাচাই করতে পারবে। প্রত্যেক আহমদীর কাছ থেকে তিনি বয়আতের অঙ্গীকার নিয়েছেন আর এই অঙ্গীকারে বয়আতের শর্তাবলী আমাদের সামনে রেখে আমাদেরকে একটি কর্মপন্থা দিয়েছেন। আর এই কর্মপন্থা অনুযায়ী প্রতিটি দিন, প্রতিটি সপ্তাহ, প্রতিটি মাস এবং প্রতিটি বছর আমল করা হয়েছে কিনা, তা আত্মজিজ্ঞাসা ও আত্মবিশ্লেষ করে দেখার এক আকাঙ্ক্ষা ও প্রত্যাশা তিনি প্রত্যেক আহমদীর কাছে ব্যক্ত করেছেন।

অতএব, আমরা যদি বছরের শেষ রাত আর নববর্ষের সূচনা আত্মবিশ্লেষন ও দোয়ার মাধ্যমে করে থাকি, তাহলে আমাদের পরিণতি শুভ হবে। আর যদি আমরাও বাহ্যিক শুভেচ্ছা এবং জাগতিক কথা বার্তার মাধ্যমে নববর্ষের সূচনা করে থাকি, তবে আমরা হারিয়েছি অনেক কিছুই কিন্তু পাই নি কিছুই আর পেলেও যৎসামান্য। দুর্বলতা যদি থেকে যায় আর আমাদের আত্মবিশ্লেষণে আমরা যদি আশ্বস্ত হতে না পারি, তাহলে আমাদের এই দোয়া করতে হবে যে, আল্লাহ্ তা'লা আমাদের আগত বছর যেন বিগত বছরের ন্যায় আধ্যাত্মিক দুর্বলতা প্রদর্শনকারী বছর না হয়, বরং আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপ যেন খোদার সন্তুষ্টির লক্ষ্যে উঠে। আমাদের প্রতিটি দিন যেন রসূলের আদর্শে অতিবাহিত দিন হয়। আমাদের দিবারাত্র যেন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে কৃত বয়আতের অঙ্গীকার পালনের দিকে আমাদের নিয়ে যায়, সেই অঙ্গীকার আমাদের কাছে এ প্রশ্ন করে যে, আমরা শিরক্ না করার অঙ্গীকার পালন করেছি কিনা? প্রতিমা এবং চন্দ্র-সূর্যের পূজা করার শিরক্ নয়, বরং মহানবী (সা.)-এর উক্তি অনুসারে সেই শিরক্, যা কর্মের ক্ষেত্রে লোক দেখানো এবং লৌকিকতার শিরক্। গোপন কামনা-বাসনায় লিপ্ত হওয়ার শিরক্। *(মসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৮০০-৮০১, হাদীস নম্বর ২৪০৩৬, আলামুল কুতুব, বৈরুত ১৯৯৮-ইং)*

এখন প্রশ্ন হল, আমাদের নামায, আমাদের রোযা, আমাদের সদকা-খয়রাত, আমাদের আর্থিক ত্যাগ স্বীকার, আমাদের সৃষ্টির সেবা মূলক কর্ম, জামা'তের কাজে আমাদের সময় ব্যয় করা, আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের পরিবর্তে আল্লাহ্ ভিন্ন অন্যদের সন্তুষ্টি অর্জন বা লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে ছিল না তো? কোথাও আমাদের হৃদয়ের সুপ্ত কামনা-বাসনা খোদার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দণ্ডায়মান হয় নি তো? এর ব্যাখ্যা হযরত মসীহ্ মওদউদ (আ.) এভাবে করেছেন যে, "তৌহিদ কেবল এর নাম নয় যে, মৌখিকভাবে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ বলবে আর হৃদয়ে থাকবে সহস্র সহস্র মূর্তি প্রতিমা। বরং যে ব্যক্তি নিজের কোন কর্ম, ধোঁকা ও প্রতারণা এবং পরিকল্পনাকে খোদার মতই গুরুত্ব দিয়ে থাকে বা কোন মানুষের উপর সেভাবে ভরসা করে, যেভাবে আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করা উচিত অথবা নিজেকে সেই গুরুত্ব দেয়, যা খোদা তা'লাকে দেয়া উচিত, এমন সকল পরিস্থিতিতে খোদার দৃষ্টিতে সে প্রতিমা পূজারী। (সিরাজ উদ্দীন ঈসায়ীকে চার সাওয়ালো কা জাওয়াব, রূহানী খাযায়েন, ১২তম খণ্ড, পৃ. ৩৪৯) অতএব, এই মানদণ্ড দৃষ্টিতে রেখে আত্মজিজ্ঞাসা করা আবশ্যক। এরপর এই প্রশ্ন আসবে যে, আমাদের বিগত বছর কি সম্পূর্ণভাবে মিথ্যা থেকে মুক্ত হয়ে শতভাগ সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে অতিবাহিত হয়েছে? অর্থাৎ, সত্য প্রকাশিত হলে নিজের ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়, এমন মুহূর্তেও সত্যকে বিসর্জন না দেয়া। (জুমুআর খুতবা, ৩০ ডিসেম্বর ২০১৬)

মূলত আমরা যে উত্তম ও পূণ্যময় কাজ করি তা আসলে আমাদের নিজেদের জন্যই কল্যাণকর হয়ে থাকে। যেভাবে আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কোরআন করিমে ইরশাদ করেন 'যে ব্যক্তি আমলে সালেহ করে তা তার নিজের জন্যই' (সুরা জাসিয়া, আয়াত: ১৫)। এই আমলে সালেহ বা উত্তম কাজ বলতে ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে সমষ্টিগত জীবনে সর্বস্তরের ছোট-বড় সকল প্রকার কল্যাণকর কাজকেই বুঝানো হয়েছে। এখানে সমাজকল্যাণমূলক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পারিবারিক ইত্যাদি সব রকমের কাজই যদি ইসলামের অনুশাসন অনুযায়ী হয় তবেই না তা আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিনের দরবারে উত্তম কাজ হিসেবে পরিগণিত হবে। আর এসব কাজের মাধ্যমেই প্রকৃত ঈমানের পরিচয় ও প্রমাণ পাওয়া যায়। তাই আমরা যদি বছরের শুরুতেই এই অঙ্গীকার করি যে, নতুন বছরে আমি কোন মন্দ কাজ করব না আর এ বছর সকল পূণ্যকর্মগুলোকে নিজেদের জীবনের সঙ্গী বানিয়ে নিব তাহলে আমাদের জীবন হবে শান্তিময় এবং আল্লাহ্‌পাকও আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকবেন।

আল্লাহ্‌রপাক এটাই চান যে, তার বান্দারা যেন সব সময় সৎ কাজ করে, তারা যেন অন্যায় কোন কাজে অংশ না নেয়। সামান্য পূণ্যকর্মকেও তিনি বৃথা যেতে দেন না। তিনি তাঁর বান্দাকে ক্ষমা ও রহমতের চাদরে আবৃত করতেই বেশি পছন্দ করেন। যেমন হাদিসে উল্লেখ আছে, হযরত আবু যার (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত নবী করিম (সা.) বলেছেন, মহান আল্লাহ্ বলেন, যে ব্যক্তি একটি সৎ কাজ করবে, সে এর দশ গুণ অথবা অধিক সওয়াব পাবে। আর যে ব্যক্তি একটি অন্যায় করবে, সে তেমনি একটি অন্যায়ের শাস্তি পাবে অথবা আমি মাফ করে দিব। যে ব্যক্তি আমার এক বিঘত নিকটবর্তী হবে, আমি তার এক হাত নিকটবর্তী হবো, যে ব্যক্তি আমার এক হাত নিকটবর্তী হবে, আমি তার দুই হাত নিকটবর্তী হবো। যে ব্যক্তি হেঁটে হেঁটে আমার কাছে আসবে আমি দৌড়ে তার কাছে যাবো। যে ব্যক্তি পৃথিবী সমান গুনাহ নিয়ে আমার সাথে সাক্ষাত করবে, অথচ সে আমার সাথে কোন কিছু শরীক করে নি, আমি তার সাথে অনুরূপ পৃথিবীভর্তি ক্ষমা নিয়ে সাক্ষাত করবো (মুসলিম)।

তাই আমাদেরকে জাগতিকতার আনন্দ-উল্লাসে ডুবে না গিয়ে মহান আল্লাহ্‌র স্মরণে বছরের সূচনা করতে হবে এবং সারা বছরই যেন আমার দ্বারা কোন অন্যায় কাজ সংঘটিত না তার দিকেও খেয়াল রাখতে হবে আর তবেই না আল্লাহ্‌পাক আমাদের ছোট-খাট ভুল-ত্রুটিগুলো ক্ষমা করে দিবেন। আল্লাহ্ তা'লা নতুন বছর দেশ, জাতি এবং গোটা বিশ্বের সবার জন্য অফুরন্ত কল্যাণ বয়ে আনুক, এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

Hakim Water Technology & Filter House
Helpline: 01711 33 89 89, Tell: +88-02-7540545
E-mail: hakimwater@gmail.com, Web: www.hakimwatertechnology.com
DRINKING WATER PLANT (INDUSTRIAL)

DRINKING WATER PURIFIER (HOUSEHOLD)
OUR SERVICES:
Drinking Water Plant, ETP, STP, DMP, Swimming Pool Plant, Iron Removal, Juice Processing Plant, Soft Drink Plant, Indoor Fishing, Chemicals ETC.
VISIT OUR PAGE & LIKE:
/hakimengineering /hakimwatertechnology /hakimindoorfishfarming /hakimwatertechnology

কলমের জিহাদ

আমাদের ধর্ম বিশ্বাসের সারমর্ম হলো-
'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ'
- ইমাম মাহদী (আ.)

"ধর্মে কোন জোর-জবরদস্তি নাই"
- আল কুরআন

মুহাম্মদ খলিলুর রহমান মন্ডল

(পূর্ব প্রকাশিত সংখ্যার পর-১০৮)

আহমদীয়া মুসলিম জামাতের সঙ্গে ধর্মীয় বিষয়ে মত–পার্থক্য: কি এবং কেন ?

হযরত ঈসা (আ.)-এর পুনরাগমন এবং ইসলামের পুনরুজ্জীবন সম্পর্কিত ভবিষ্যত-বাণী সমূহের সঠিক ব্যাখ্যা কি?

আহমদী মুসলমানরা বিশ্বাস করে যে, যেহেতু বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর পূর্বে আগমানকারী বনী ইস্রায়েলী নবী হযরত ঈসা (আ.) ইন্তেকাল করেছেন সেজন্য তাঁর পুনরাগমণ সংক্রান্ত ভবিষ্যৎবাণীগুলো রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে এবং সেগুলোর প্রকৃত তাৎপর্য গ্রহণ করতে হবে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মাধ্যমে। পক্ষান্তরে অন্যান্য অধিকাংশ মুসলিম ধর্মীয় নেতাগণ বিশ্বাস করেন যে, হযরত ঈসা (আ.) অদ্যাবধি আকাশে জীবিত আছেন এবং আখেরী যুগে তিনি সশরীরে পৃথিবীতে আগমন করবেন এবং তাঁর মাধ্যমে ইসলামের পুরুজ্জীবন সংঘটিত হবে। তাঁদের এই ধরণের বিশ্বাস সম্পর্কে ব্যাপক প্রচার-পদ্ধতির একটি সাম্প্রতিক কালের দৃষ্টান্ত নিম্নরূপঃ

হযরত ঈসা (আ.)-এর পুনরায় আগমন সম্পর্কে বাংলাদেশ স্কুল শিক্ষাবোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত স্কুলের অষ্টম-শ্রেণির পাঠ্য-পুস্তক থেকে সংগৃহিত নিম্নোক্ত উদ্ধৃতি দ্রষ্টব্যঃ

'শেষ যামানায় পৃথিবী ধ্বংস হওয়ার আগে হযরত ঈসা (আ.) পুনরায় দুনিয়াতে আগমন করবেন। এসে তিনি ৪৫ বছর পৃথিবীতে অবস্থান করবেন এবং দাজ্জালকে হত্যা করবেন। জিযিয়া প্রথা (অমুসলিম থেকে আদায়কৃত নিরাপত্তা কর) তুলে দেবেন। ক্রুশ ভেঙে ফেলবেন। সমস্ত শূকর মেরে ফেলবেন। আল্লাহ্‌র ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করবেন। এ সময় পৃথিবীর লোকজনের আর্থিক অবস্থা এত উন্নত হবে যে, দান-সদকা নেওয়ার মতো কাউকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। হযরত ঈসা (আ.) মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর উম্মত হয়ে তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে ইসলামের দিকে আহ্বান করবেন। এরপর তিনি স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করবেন এবং তাঁকে রাসুল (সা.)-এর রওজা মুবারকের পাশে দাফন করা হবে। কিয়ামতের দিন তাঁরা দু'জনা একই স্থান হতে উঠবেন।' (পুস্তক ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা, পৃষ্ঠা- ১১২, ২০১৩ শিক্ষাবর্ষ)

হযরত ঈসা (আ.)-এর পূনরাবির্ভাবের প্রতিশ্রুতি শাব্দিক অর্থে পূর্ণ হওয়া সম্ভব নয়ঃ

মুসলিম উম্মতের মধ্যে একতা ও সংহতি প্রতিষ্ঠার জন্য এবং ইসলামী শিক্ষা ও আদর্শের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও পূর্ণ-প্রচারের জন্য এবং পৃথিবীব্যাপী সকল ধর্ম ও মতবাদের উপর ইসলামের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার্থে আখেরী যুগে হযরত ঈসা (আ.)-এর আবির্ভাবের প্রতিশ্রুতি রয়েছে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ নিম্নোক্ত ভবিষ্যদ্বাণীগুলোর শাব্দিক অর্থ গ্রহণের পরিবর্তে ব্যাখ্যা সাপেক্ষে অর্থ গ্রহণ করাই যুক্তি-সঙ্গত। শুধু শাব্দিক অর্থ গ্রহণ করলে বিষয়গুলো হবে অসম্ভব এবং অযৌক্তিক। শাব্দিকভাবে এগুলোর পূর্ণতা কেন সম্ভব নয় তা ভেবে দেখার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

(১) পবিত্র কুরআনের সূরা জুমুআতে ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে যে, আখেরী যুগে বিশ্বনবী মুহাম্মদ (সা.) পুনরায় আগমন করবেন।

(২) সূরা নূরের ৭ম রুকুতে ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে যে, ঈমানদার এবং সৎকর্মশীল মুসলিম উম্মাহর জন্য খেলাফতের সংগঠন একটি ঐশী প্রতিশ্রুত বিষয় যেভাবে পূর্ববর্তী মূসায়ী শরীয়তে খেলাফত প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল।

(৩) সহী বুখারী শরীফের হাদীসে প্রতিশ্রুতি রয়েছে, "কায়ফা আনতুম এযা নাযালা ইবনে-মরিয়ামা ফিকুম ওয়া ইমামুকুম।" অর্থ- তোমাদের অবস্থা কিরূপ হবে যখন তোমাদের মধ্যে ইবনে মরিয়ম আবির্ভূত হবেন এবং তোমাদের মধ্য থেকেই তোমাদের ইমাম হবেন।

(৪) অনুরূপভাবে সহী মুসলিম শরীফে প্রতিশ্রুতি রয়েছেঃ

'কায়ফা আনতুম এযা নাযালা ইসাবুন মার-ইয়ামা ফিকুম আম্মাকুম মিনকুম।" অর্থ: তোমাদের অবস্থা কিরূপ হবে যখন তোমাদের মধ্যে ঈসা ইবনে মরিয়ম আবির্ভূত হবেন? ফলত: তিনি তোমাদের মধ্যে হতেই তোমাদের নেতৃত্ব দান করবেন।

(৫) সহী ইবনে মাজাহ শরীফে বলা হয়েছে যে, প্রতিশ্রুত মাহ্‌দী ও ঈসা ইবনে মরিয়ম একই ব্যক্তি হবেন (লাল মাহদী ইল্লা ঈসাবনু মারাইয়ামু)।

(৬) দাজ্জাল ও দাজ্জালের গাধা এবং ইয়াজুজ-মাজুজ সংক্রান্ত বিষয়গুলোর প্রকৃত তাৎপর্য কি? এতদ্‌সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীগুলো শাব্দিক অর্থে প্রয়োগ করলে সেগুলো হবে খুব অবাস্তব এবং অযৌক্তিক।

(৭) হযরত ইমাম মাহ্‌দী ও প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.)-এর কার্যাবলী সংক্রান্ত হাদীসে বলা হয়েছে যে, প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) আবির্ভূত হয়ে নিম্নে বর্ণিত কার্যাবলী সম্পাদন করবেন:

(ক) ক্রুশ ধ্বংস করবেন; (খ) শুকর বধ করবেন; (গ) যুদ্ধ রহিত করবেন; (ঘ) দাজ্জাল বধ করবেন (ঙ) প্রচণ্ড যুদ্ধ করবেন এবং অঢেল ধন-সম্পদ বিতরণ করবেন ইত্যাদি। (চ) হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর নাম, বংশ, স্থান, বিষয়ে নানা প্রকার বর্ণনা রয়েছে।

এই ধরণের আরো অনেক বর্ণনা রয়েছে যেগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রে শাব্দিক অর্থের পরিবর্তে ব্যাখ্যা সাপেক্ষে বুঝার চেষ্টা করা অধিকতর যুক্তিসঙ্গত এবং সুদূর প্রসারী তত্ত্ব ও তথ্যের ইঙ্গিত বাহক। এই ধরণের রূপক বর্ণনার তাৎপর্য কী? পবিত্র কুরআন ও হাদীসে রূপক বর্ণনার দৃষ্টান্ত আছে কি? সাহিত্য-কর্ম ইত্যাদিতে রূপকের দৃষ্টান্ত আছে কি? এই বিষয়গুলো পরিষ্কারভাবে জানা দরকার এবং প্রকৃত তত্ত্ব ও তথ্যাবলীর সু-গভীর তাৎপর্য সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক।

উল্লেখ্য যে, শুধু ভাসা-ভাসা জ্ঞান এবং কল্প-কাহিনী মূলক বিদ্যা-বুদ্ধি দ্বারা প্রভাবিত হয়ে অনেক মোল্লাশ্রেণির পণ্ডিতগণ উপরোক্ত ভবিষ্যদ্বাণীগুলোর শাব্দিকভাবে পূর্ণতার উপর জোর দিয়ে থাকেন। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ পবিত্র কুরআনে বর্ণিত মহানবী মুহাম্মদ (সা.)-এর পুনরাগমণ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী শাব্দিক অর্থে পূর্ণতার বিষয়টি একটি অবাস্তব এবং অকল্পনীয় ব্যাপার। তবে বিষয়টির রূপকাবৃত অর্থ অবশ্যই সত্য এবং সঠিক। যেভাবে বুখারী শরীফের হাদীসে এই কথার প্রেক্ষিতে প্রতিশ্রুত সংস্কারকের আগমনের প্রতিশ্রুতি রয়েছে।

তেমনি ভাবে হাদিসে বর্ণিত ঈসা (আ.)-এর পুনরাগমনের শাব্দিক অর্থ কখনই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। তবে ব্যাখ্যা সাপেক্ষে ঈসা-সদৃশ মহাপুরুষের আগমন হওয়ার কথাই বলা হয়েছে। অনুরূপভাবে আগমনকারী ঈসা (আ.) কর্তৃক ক্রুশ ধ্বংস করা, শুকর বধ করা ইত্যাদি বিষয়গুলো শাব্দিক অর্থে শুধু অসম্ভবই নয়, বরং হাস্যাস্পদ কেচ্ছা-কাহিনীর ফানুষ যা একজন সম্মানিত নবীর পক্ষে মর্যাদাহানীকর। কারণ শাব্দিক অর্থে কাঠের বা ধাতু-নির্মিত ক্রুশগুলো ভেঙ্গে ফেলা এবং বনে-জঙ্গলে অথবা ক্ষেত-খামারে শুকরগুলো নিধন করা সম্ভবপর নয় এবং কোন কারণে সম্ভব হলেও নিরর্থক কাজই বটে। ভাবতে অবাক লাগে যে, কিছু কিছু পণ্ডিত ব্যক্তিও শাব্দিক অর্থের পরিবর্তে রূপকের অন্তরালে নিহিত সুগভীর অর্থ- গ্রহণ করতে পারছেন না কেন? এই বিষয়ে যে বিভ্রান্তি রয়েছে তা দূরীভূত করে প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটন করা অত্যাবশ্যক।

যীশুর পুনরাগমন সম্বন্ধে খৃষ্টান এবং অধিকাংশ মুসলমান অদ্যাবধি আকাশের দিকে তাকিয়ে আছেন। মাঝে মাঝে পশ্চিমা জগতে এ সম্বন্ধে নানা প্রকার গুজব ছড়ানো হয়। যীশুর আগমনের তারিখ দিন-মাস ক্ষণসহ পত্র-পত্রিকায় তুলকালাম কাণ্ড ঘটে যায়। কিছুদিন পর বিষয়টি কর্পুরের মত উড়ে যায়। মূলত ভবিষ্যদ্বাণীর ভাষা বুঝতে না পারার কারণে অধিকাংশ মুসলমানও হযরত ঈসা (আ.)-এর আকাশে গমন, সশরীরে আকাশে ২০০০ বছর ধরে অবস্থান এবং যে কোন সময় পৃথিবীতে অবতরণের আশায় অপেক্ষমান রয়েছেন। ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কিত বর্ণনার শাব্দিক অর্থ গ্রহণ করার এই দৃষ্টান্ত মানবজাতির ইতিহাসের এমন একটি ঘটনা যার প্রকৃত ব্যাখ্যা এবং মর্মার্থ উপলব্ধি করতে পারলে ইহুদী ও খৃষ্টান এবং মুসলমানদের ভ্রান্ত ধারণার চির অবসান ঘটতে পারে।

ভবিষ্যদ্বাণীসহ বিভিন্ন বর্ণনার ক্ষেত্রে রূপক এবং আলংকারিক ভাষার আবশ্যকতাঃ

প্রশ্ন হলো যে হযরত ঈসা (আ.)-এর পুনরাগমন সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী কিভাবে পূর্ণ হবে? আজ হতে দু'হাজার বছর পূর্বে আগমনকারী বণী ইসরাঈলী নবী হযরত ঈসা (আ.) কি সশরীরে এই পৃথিবীতে পুনরায় আবির্ভূত হবেন, অথবা সেই হযরত ঈসা (আ.)-এর অনুরূপ কোন মহাপুরুষ (অর্থাৎ 'মসীলে ঈসা' হিসেবে) মুসলিম উম্মত হতেই আবির্ভূত হবেন? পবিত্র কুরআন, হাদীস, ইতিহাসের ঘটনা এবং বৈজ্ঞানিক তথ্যাবলীর ভিত্তিতে সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয়েছে যে, হযরত ঈসা (আ.) ইন্তেকাল করেছেন। সুতরাং, সশরীরে এই পৃথিবীতে এসে তাঁর পক্ষে ইসলামের প্রচার ও পুনঃপ্রতিষ্ঠার গুরুদায়িত্ব পালন করার প্রশ্ন উঠেনা। এমতাবস্থায় 'মসীলে ঈসা' (ঈসা তুল্য) হিসাবে মুসলিম উম্মত হতেই তাঁর আবির্ভাব হওয়ার মাধ্যমে উপরোক্ত ভবিষ্যদ্বাণী সমূহ পূর্ণ হওয়াটাই স্বাভাবিক। ভবিষ্যদ্বাণীতে ব্যবহৃত ভাষার এরূপ সাদৃশ্য ও প্রতীকপূর্ণ প্রয়োগ এবং সেগুলির ব্যাখ্যা ও তাবির করার রীতি রয়েছে। স্বয়ং হযরত ঈসা (আ)-এর যুগের একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। দৃষ্টান্তটি নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

ইহুদীদের ধর্মীয় গ্রন্থাবলীতে বর্ণিত প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী (মালাখী ৪ : ৫ এবং রাজাবলী ২ : ১১ পদ) ইহুদীরা বিশ্বাস করে যে, এলিয়া নবী অর্থাৎ হযরত ইলিয়াস (আ.) আকাশে জীবিত রয়েছেন এবং ঈসা মসীহ্ (আ.)-এর আবির্ভাবের পূর্বে প্রথমত: তিনিই আকাশ হতে অবতরণ করবেন। ইহুদীদের এই দাবীর উত্তরে সমাগত নবী হযরত ঈসা ইবনে

মরিয়ম (আ.) বলেন যে, উক্ত ঐশী প্রতিশ্রুতি হযরত ইয়াহিয়া (আ.)-এর আগমণে পূর্ণ হয়ে গিয়েছে (মথি: ১১:১৪ দ্রষ্টব্য)। এই ঘটনা দ্বারা প্রমাণীত হয় যে, (১) হযরত ইলিয়াস (আ.)-এর মসীল (অনুরূপ বা সদৃশ) হিসেবে হযরত ইয়াহিয়া (আ.)-এর আবির্ভাব ঘটেছে, (২) আকাশ হতে কোন ব্যক্তির সশরীরে অবতরণ করার ধারণা পূর্বেও ছিল এবং সেই ধারণা একজন 'সদৃশ' নবীর আগমনের দ্বারা রূপকভাবে পূর্ণ হয়েছে এবং (৩) আজও যে সকল ইহুদী এই ধারণা অর্থাৎ শাব্দিক অর্থে ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হওয়ার জন্য আকাশের দিকে চেয়ে রয়েছে তাদের আশা কোন দিনই পূরণ হবে না।

তেমনি ভাবে বর্তমানকালে যারা ভবিষ্যদ্বাণীর তাৎপর্য বুঝতে না পেরে "বণী ঈসরাঈলী নবী হযরত ঈসা (আ.) সশরীরে প্রায় দু'হাজার বছর ধরে আকাশে অবস্থান করার পর বর্তমানের সমস্যা-বিক্ষুব্ধ মুসলিম জাতিসহ বিশ্বকে উদ্ধার করার লক্ষ্যে পৃথিবীতে অবতরণ করবেন"- এই আশায় দিন কাটাচ্ছে তারাও অতীতের ন্যায় ভুল করছেন এবং তাদের সেই আশা কখনই পূর্ণ হতে পারে না এবং ভবিষ্যতেও পূর্ণ হবে না। কারণ কোন মানুষের পক্ষে এই দীর্ঘ সময় ধরে আকাশে বসবাস করা প্রকৃতির নিয়ম বিরুদ্ধ অস্বাভাবিক ব্যাপার। সুতরাং, হযরত ঈসা (আ.)-এর পুনরাগমনের ভবিষ্যদ্বাণী, তাঁর সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির আগমনের দ্বারা পূর্ণ হওয়া অধিকতর যুক্তিসিদ্ধ এবং এটাই হযরত ইলিয়াস (আ.) ও হযরত ইয়াহিয়া (আ.)-এর ঘটনা দ্বারা সমর্থিত এক ঐতিহাসিক সত্য। এই বিষয়টির মধ্যে যে তত্ত্ব ও তথ্যগত সূক্ষ্মতা রয়েছে তা সঠিকভাবে উপলব্ধি করা অত্যাবশ্যক এবং তজ্জন্য বাহ্যিক জ্ঞান-বুদ্ধি ছাড়াও আল্লাহ্‌র কাছে দোয়ার মাধ্যমে সাহায্য কামনা করা উচিত।

পবিত্র কুরআন ও হাদীস হতে জানা যায় যে, মুসলিম উম্মতের মধ্যে থেকেই আখেরী যুগে মুসলমানদের জন্য নেতৃত্বদানকারী খলিফা, মোজাদ্দিদ এবং ইমাম মাহদী ও মসীহ মওউদ বা প্রতিশ্রুত ঈসা (আ.)-এর আগমনের প্রতিশ্রুতি রয়েছে। এই সকল ভবিষ্যৎবাণী সম্বন্ধে একটি নীতিগত বিষয়ের উল্লেখ করা প্রয়োজন। এ ধরণের ভবিষ্যৎবাণীতে যথেষ্ট পরিমাণে প্রতীক বা রূপকের ব্যবহার হয়ে থাকে এবং পরোক্ষ পদ্ধতিতে সাদৃশ্যপূর্ণ ইশারা ও ইঙ্গিত মিশ্রিত থাকে।

এই ধরণের ভবিষ্যদ্বাণীতে রূপক বর্ণনার প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণঃ

(ক) যদি এরূপ পদ্ধতি গ্রহণ করা না হতো তাহলে আগমনকারী প্রতিশ্রুত ব্যক্তির পক্ষে শৈশবে স্বাভাবিক ভাবে জীবন যাপন করা এবং যথা সময়ে প্রত্যাদেশ মোতাবেক দায়িত্ব পালন করা অসম্ভব হতো।

(খ) সেই সঙ্গে সাধারণ মানুষের জন্য ঈমানের পরীক্ষারও প্রয়োজন হতো না।

(গ) এরূপ পরোক্ষ পদ্ধতি ও নীতি ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বেকার ধর্মীয় গ্রন্থাবলীতেও অনুসৃত হয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ ইসলামের অব্যবহিত পূর্বে আগমনকারী হযরত ঈসা (আ.) সম্পর্কিত তৌরাতের ভবিষ্যৎ বাণী সমূহের কথা বলা যেতে পারে। সেই সকল ভবিষ্যৎবাণী পূর্ণ করে যখন যখন ঈসা (আ.) আগমন করলেন, তখন সমসাময়িক ইহুদী পণ্ডিতগণই তাঁর সর্বাধিক বিরোধিতা করলেন এবং তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যার চেষ্টা করলেন। আজ দু'হাজার বছর ধরে ইহুদীরা তাদের জন্য প্রত্যাদিষ্ট পরিত্রাণকারীর আশায় অপেক্ষা করছে।

দুই রকম বর্ণনা-রীতি (মুহকাম আয়াত এবং মুতাশাবিহ আয়াত)

পবিত্র কুরআনের সূরা আলে ইমরান (৩:৮) আয়াতে দুরকম বর্ণনা-রীতির উল্লেখ রয়েছেঃ

"তিনিই তোমার উপর এই কিতাব নাযিল করিয়াছেন যাহার কতকগুলি 'আয়াতুম মুহাকামাত' (অর্থাৎ দ্ব্যর্থহীন সুস্পষ্ট আয়াত) যেগুলি এই কিতাবের মূল এবং অন্যগুলি 'মুতাশাবিহ আয়াত' (পরস্পর সাদৃশ্যপূর্ণ রূপক এবং ব্যাখ্যামূলক আয়াত)। কিন্তু যাহাদের অন্তরে বক্রতা আছে তাহারা ফিতনা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে এবং ইহার অপব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে ঐ অংশের অনুসরণ করে যাহা পরস্পর সাদৃশ্যপূর্ণ রূপক- অথচ ইহার প্রকৃত ব্যাখ্যা জানেন কেবল আল্লাহ্‌ এবং জ্ঞানে পরিপক্ক লোকগণ- তাহারা বলে, 'আমরা ইহার উপর ঈমান রাখি, সবই আমাদের প্রভুর পক্ষ হইতে সমাগত'। বস্তুতঃ ধীমান চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ ব্যতীত অনেকেই উপদেশ গ্রহণ করে না।'

এই আয়াতে দুই প্রকার বর্ণনা-রীতির কথা বলা হয়েছেঃ

❖ 'মুহকাম আয়াত' দ্বারা দৃঢ় এবং সুস্পষ্ট অর্থ-বিশিষ্ট এবং দ্ব্যর্থহীন শিক্ষা বহনকারী আয়াতের কথা বলা হয়েছে (মুফরাদাত এবং লেইন)। এগুলো হলো উম্মুল কিতাব অর্থাৎ কুরআনের ভিত্তিমূলক আয়াত।

❖ 'মুতাশাবিহ আয়াত' দ্বারা বাক্য বা বাক্যাংশকে বুঝায় যার বিভিন্ন অর্থ বা ব্যাখ্যা করা যায় এবং ঐ বিভিন্নতার মাঝেও মুহকাম আয়াতের সঙ্গে এর একটি ঐক্য এবং সাদৃশ্যপূর্ণ সম্পর্ক থাকে। মুতাশাবিহ আয়াতের প্রকৃত অর্থ এবং ব্যাখ্যা একমাত্র আল্লাহ্‌ তা'লা সম্যকভাবে জানেন এবং যারা ঐশী সাহায্য প্রাপ্ত পরিপক্ক জ্ঞানী তারা তা বুঝতে পারেন। পক্ষান্তরে, অপব্যাখ্যাকারীগণ বিশৃঙ্খলা এবং ফিতনা সৃষ্টি করতে কার্পণ্য করে না।

পুনরাগমন সম্পর্কে কতকগুলো ভবিষ্যদ্বাণীর তাৎপর্যঃ

(১) মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর দ্বিতীয় আবির্ভাবের প্রকৃত তাৎপর্য

সূরা জুমুআ (৬২ : ৪) অনুযায়ী আখেরী যামানায় মহানবী মুহাম্মদ (সা.)-এর দ্বিতীয়

আগমনের যে ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে ("ওয়া আখারিনা মিনহুম লাম্মা ইয়ালহাকুবিহিম") তা স্বয়ং নবী করীম মুহাম্মদ (সা.) ব্যাখ্যা করতঃ বলেছেন যে, তিনি স্বয়ং আগমন করবেন না তবে তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে এক ব্যক্তির আগমন ঘটবে যিনি ইসলামের হারানো গৌরবকে পুনরায় পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করবেন; (বুখারী: কিতাবুত তাফসীর)। উল্লেখ যে, সেই প্রতিশ্রুত ব্যক্তিকে অন্যান্য হাদীসে প্রতিশ্রুত মসীহ, ইমাম মাহ্‌দী, খলিফা- তুল্লাহ ইত্যাদি উপাধী দ্বারা আখ্যায়িত করা হয়েছে।

(২) 'ঈসা-সদৃশ' এবং 'ঈসার অনুরূপ' অর্থাৎ মসীলে ঈসা এবং খলিফাতুল্লাহ হিসেবে আগমনের প্রতিশ্রুতিঃ

আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে সূরা নূরের ৭ম রুকুতে মুসলিম উম্মত হতে ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন:

'ওয়াদাল্লাহুল লাযিনা আমানু মিনকুম ওয়া আমেলুস সালেহাতে লা ইয়াসতাখলেফান্নাহুম ফিল আরদে কামাস–তাখলাফাল লাযিনা মিন কাবলিহিম।" (আয়াত- ৫৬)

অর্থ: "তোমাদের মধ্যে যাহারা ইমানদার ও সৎকর্মশীল তাদের সঙ্গে আল্লাহ্ ওয়াদা করেছেন যে, তিনি নিশ্চয়ই তাহাদিগকে পৃথিবীতে খলিফা বানাইবেন যেভাবে তিনি তাহাদের পূর্ববর্তীদের মধ্য হইতে খলিফা বানাইয়াছেন।"

উপরোক্ত আয়াতে খেলাফত প্রতিষ্ঠার রূপরেখা সম্বন্ধে পূর্ববর্তী মূসায়ী উম্মতের সঙ্গে সাদৃশ্য বুঝানোর জন্য আরবী 'কামা' (অনুরূপ বা সাদৃশ্য) শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। পবিত্র কুরআনে অন্যত্র হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সঙ্গে হযরত মূসা (আ.)-এর সাদৃশ্য বর্ণনার জন্য 'কামা' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে (সূরা মুযজাম্মিল, আয়াত- ১৬)। তৌরাতেও মূসা-সাদৃশ্য নবীর ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে (ডিউটারোনমি, ১৮:১৫-২০)। এই উপমা দ্বারা কোন কোন বিষয়ে সাদৃশ্যের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। বস্তুতপক্ষে হযরত মুহাম্মদ (সা.) শুধু হযরত মূসা (আ.) হতে শ্রেষ্ঠতর নহেন, তিনি সর্বকালের নবীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম। উপরোক্ত সূরা নূরে খেলাফতের রূপরেখা সম্বন্ধে যে সাদৃশ্যের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে তা থেকে সাধারণভাবে হযরত মূসা (আ.) এবং হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মধ্যস্থিত সাদৃশ্য এবং তাঁদের অনুসারীগণের সাদৃশ্য ছাড়াও বিশেষভাবে বর্তমান যুগের জন্য একটি ভবিষ্যদ্বাণীর ইঙ্গিত রয়েছে। ইহুদীদের চরম অধ:পতনের যুগে হযরত মূসা (আ.)-এর আগমনের পর চতুর্দশ শতাব্দীতে যেভাবে হযরত ঈসা (আ.)-এর আগমনের প্রয়োজন ছিল, তেমনি ভাবে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর পর চতুর্দশ শতাব্দিতে একজন খলিফা আসা আবশ্যক- যিনি আধ্যাত্মিক গুণাবলী ও আদর্শে হযরত ঈসা (আ.)- এর অনুরূপ হবেন। 'হযরত ঈসা-সাদৃশ্য' এরূপ খলিফাকেই হাদীসে প্রতিশ্রুত ঈসা (মসীহ মাওউদ) এবং 'ইমাম মাহ্‌দী' বলে অভিহিত করা হয়েছে।

উপরোক্ত আয়াতের অন্তর্নিহিত তত্ত্ব ও তথ্যের সমর্থনে নিচে কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করা হলো।

❖ ইবনে মাজার হাদীসে প্রতিশ্রুত মহাপুরুষকে 'খলিফাতুল্লাহিল মাহ্‌দী' (আল্লাহ্‌র খলিফা মাহ্‌দী) বলা হয়েছে: "ফা এযা রায়াইতুমুহু ফাবাই-উহু ওয়ালাও হাবওয়ান আলাছ ছালজে ফা-ইন্নাহু খলিফাতুল্লাহিল মাহদীউ।" অর্থ:- 'ইমাম মাহ্‌দী প্রকাশিত হওয়ার সংবাদ পাওয়া মাত্রই তাঁর হাতে বয়াত (দীক্ষা গ্রহণ) করিও, এমন কি যদি বরফের উপর হামাগুড়ি দিয়েও যেতে হয় তবুও। নিশ্চয় তিনি আল্লাহ্‌র খলিফা ইমাম মাহদী।

❖ অন্য একটি হাদীসে আখেরী যুগে মসীহ (আ.)-এর আগমনের কথা বলা হয়েছে: "কায়ফা তাহলেকু উম্মাতুন আনা ফি আউয়ালিহা ওয়াল মসীহ কি আখেরিহা।" (অর্থ: 'আমার উম্মত কেমন করে ধ্বংস হবে যার প্রথমদিকে আমি রয়েছি এবং শেষ দিকে মসীহ রয়েছেন"- মেশকাত ও জামেউস সগীর)।

❖ তিরমিযি শরীফের একটি হাদীসে মুহাম্মদী উম্মতের অবস্থার সঙ্গে বনী ঈসরায়েলী অবস্থার সাদৃশ্য বর্ণিত হয়েছে: "লাইয়াতিআন্না আলা উম্মতি কামা আতা আলা বণী ঈসরাঈল" (অর্থ: আমার উম্মত বণী ঈসরাঈল জাতির অনুরূপ হবে")।

❖ অন্য একটি হাদীসে মুসলিম ইতিহাসের একটি রূপরেখা বর্ণীত হয়েছে। হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.) বলেছেন: "আল্লাহ্ তা'লা যতদিন চাহেন তোমাদের মধ্যে এই নবুয়ত থাকিবে এবং তাহার পর তিনি তা উঠাইয়া লইবেন। তাহার পর নবুয়তের তরিকায় খেলাফত হইবে। যতদিন আল্লাহ্ তা'লা চাহেন ততদিন উহা থাকিবে এবং তাহার পর তিনি উহা উঠাইয়া লইবেন। তারপর জুলুমের সাথে রাজতন্ত্র কায়েম হইবে এবং যতদিন আল্লাহ্ চাহেন ততদিন উহা থাকিবে। তাহার পর জোরপূর্বক শাসন (তথা সাম্রাজ্যবাদ) কায়েম হইবে এবং আল্লাহ্ তা'লা যতদিন চাহেন ততদিন উহা থাকিবে এবং তাহার পর তিনি উহা উঠাইয়া লইবেন। তারপর পুনরায় নবুয়তের তরিকায় খেলাফত কায়েম হইবে। অতঃপর তিনি (সা.) চুপ ছিলেন' (মেশকাত)।

উপরোক্ত হাদীসের ভবিষ্যদ্বাণী পর্যায়ক্রমে পূর্ণ হয়ে বর্তমান যুগে এসে 'খেলাফত আলা মিনহাজিন নবুয়ত' পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ইন্তেকালের পর খেলাফতে রাশেদা (৬৩২-৬৬১ খৃ:) , অত:পর রাজতন্ত্রমূলক উমাইয়া শাসন ব্যবস্থা (৬৬১-৭৫০ খৃ:), তারপর আব্বাসীয় সাম্রাজ্যবাদী শাসন (৭৫০-১২৫৮ খৃ:) এবং ওসমানীয় সাম্রাজ্যবাদী শাসন (১২৮৮-১৯০৮ খৃ:) দ্বারা উপরোক্ত ভবিষ্যদ্বাণী পর্যায়ক্রমে পূর্ণতা লাভ করেছে। সুতরাং, যুক্তিসঙ্গতভাবে উক্ত হাদীসের শেষাংশে বর্ণীত 'খেলাফত আলা মিনহাজিন নবুয়ত' সম্পর্কিত ভবিষ্যৎ বাণীও পূর্ণ হওয়া আবশ্যক।

(৩) মসীহ্ এবং মাহদী একই ব্যক্তি: কয়েকটি ভবিষ্যৎবাণী

আর একটি বিষয় হলো এই যে, বর্তমান কালের জন্য প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী

দুজন পৃথক ব্যক্তিত্ব কিনা। সাধারণ ধারণা এই যে তাঁরা দুই ব্যক্তি। কিন্তু আমরা সহীহ্ হাদীসে দেখতে পাই যে-

(ক) হযরত রসুল করীম (সা.) বলেছেন **"লাল্ মাহদীয়ু ইল্লা ইসা"** অর্থাৎ- ঈসা ব্যতীত অন্য কোন মাহ্দী নাই (ইবনে মাজাহ)

(খ) তিনি আবার বলেছেন- "কায়ফা আনতুম এষা নাযালাফিকুম ইবিনু মারইয়ামা ওয়া ইমামুকুম মিনকুম" অর্থাৎ- "তোমাদের অবস্থা কিরূপ হবে যখন তোমাদের মধ্যে ইবনে মরিয়মের আবির্ভাব হবে এবং তোমাদের ইমাম তোমাদের মধ্য হতে হবে। (বোখারী-কেতাবুল আম্বিয়া, নযুলে ঈসা ইবনে মরিয়ম অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

(গ) নিম্নোক্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণীত হয় যে, প্রতিশ্রুত ইমাম মাহ্দী এবং প্রতিশ্রুত ঈসা (আ.) একই ব্যক্তি হবেন- ভিন্ন ভিন্ন হবেন না।

"তোমাদের মধ্যে যাহারা জীবিত থাকিবে তাহারা দেখিতে পাইবে ঈসা ইবনে মরীয়মকে ন্যায়-বিচারক ইমাম মাহ্দীরূপে। তিনি ক্রুশ ধ্বংস করিবেন এবং শুকর নিধন করিবেন এবং ধর্মযুদ্ধ রহিত করিবেন।" (মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল)।

উপরোক্ত উদ্ধৃতিগুলো হতে এ কথা সুস্পষ্ট যে, হযরত মসীহ্ (আ.)-এর সময়ে তিনি ব্যতীত আর কেহ মাহদী হবেন না এবং তিনি এই উম্মতের ইমাম হবেন। তিনি এই উম্মতের মধ্য থেকেই হবেন, বাহির থেকে হবেন না। সুতরাং, একজন সত্যিকার মোমেনের উচিৎ এ বিষয়ে সতর্কভাবে চিন্তা-ভাবনা করা। যদি কোথাও মসীহ্ ও মাহদী দুই ভিন্ন ব্যক্তিরূপে বর্ণিত হয়ে থাকেন, তাহলে আমাদের উচিৎ "লাল মাহদীয়ু ইল্লা ঈসা' এই সুস্পষ্ট হাদীসের আলোকে অর্থোপলব্ধি করা। তাহলে আমরা অন্যান্য হাদীস সহজভাবে ব্যাখ্যা করতে সমর্থ হবো। আমরা বলতে পারি যে, প্রতিশ্রুত ব্যক্তি একজন সাধারণ সংস্কারক অর্থাৎ 'মাহদী' হিসাবে জীবন শুরু করবেন এবং তারপর তাঁকে মসীহের দায়িত্ব অর্পণ করা হবে অর্থাৎ তিনি প্রতিশ্রুত মসীহ হিসাবে পরিচিত হবেন। যদি আমরা এভাবে ব্যাখ্যা না করি তাহলে আমাদের পক্ষে অন্য কোন প্রকারে হাদীসের বর্ণনা সমূহের সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব নয়। কারণ কোন কোন হাদীসে মসীহ ও মাহদীকে দুই ব্যক্তি এবং কোন কোন হাদীসে একই ব্যক্তি বলে বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথমোক্ত হাদীসগুলোকে রূপক অর্থে গ্রহণ করলে আপাতঃদৃষ্ট পারস্পরিক বিরোধিতা দূরীভূত হয়। নবীগণ বহুক্ষেত্রে রূপক বর্ণনা পদ্ধতি ব্যবহার করেন, আর সেই সকল রূপক বর্ণনা ভবিষ্যদ্বাণী সমূহকে অধিকতর অর্থবহ করে তোলে।

(৪) হযরত ঈসা (আ.)-এর পুনরাগমন ও ইসলামের বিশ্ব-বিজয়ের প্রতিশ্রুতিঃ

সূরা সাফঃ ১০, ফাত্হঃ ২৯-৩০, রা'দঃ ৪২, তাওবাঃ ৩৩, সংশ্লিষ্ট হাদীসের ভবিষ্যদ্বাণী এবং বুযুর্গাণে উম্মতের অভিমত দ্বারা প্রমাণীত হয় যে, প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আঃ)- এর মাধ্যমে ইসলামের প্রচার-মূলক বিজয়ের প্রতিশ্রুতি পূর্ণতা লাভ করবে। এই বিষয়ে নিম্নোক্ত উদ্ধৃত্তিগুলো দ্রষ্টব্যঃ

(i) আল্লাহ্তা'লা বলেছেনঃ

"তিনি তাঁহার রসূলকে হেদায়াত এবং সত্য ধর্ম সহকারে পাঠাইয়াছেন যেন তিনি ইহাকে সকল ধর্মের উপর জয়যুক্ত করিয়া দেনড় কাফেরগণ যত অসন্তুষ্টই হোক না কেন।" (সূরা সাফ-১০)

(ii) হযরত রসূল করীম (সা.) বলেছেনঃ

"তাহার আগমন যুগে ইসলাম ব্যতীত সকল ধর্মকে আল্লাহ্ তা'লা নির্মূল করিয়া দিবেন।" (সহী মুসলীম)

"সেই উম্মত কিরূপে ধ্বংস হইতে পারে যাহার প্রথমে রহিয়াছি আমি এবং শেষে রহিয়াছে ঈসা-ইবনে মরীয়ম।" (ইবনে মাজা)

(iii) তফসীরঃ ইবনে জারীর (রহ.)

"উহা (সকল ধর্মের উপর ইসলামের প্রাধান্য বিস্তার) প্রতিশ্রুত ঈসা ইবনে মরীয়মের আবির্ভাব কালে সংঘটিত হবে।"

(iv) তফসীরঃ বেহারুল আনওয়ারঃ

"এই আয়াত 'কায়েম আলে মুহাম্মদ' (অর্থাৎ ইমাম মাহ্দী (আ.) সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে।"

ভবিষ্যদ্বাণীগুলোর পূর্ণতার সারাংশঃ

উল্লেখ্য যে, 'ইমাম মাহ্দী' ও 'প্রতিশ্রুত মসীহ্রূপে চতুর্দশ হিজরীতে আগমণকারী দাবীকারক এবং আহমদীয়া মুসলিম জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মীর্যা গোলাম আহ্মদ (আ.)-এর আবির্ভাব এবং তাঁর সংস্কারমূলক কার্যাবলী, তাঁর লিখিত পুস্তকাবলী (৮৮ খানা), ক্রমবর্ধমান প্রচার-ব্যবস্থা ও সাংগঠনিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে উপরোক্ত ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ যথার্থভাবে পূর্ণতা লাভ করছে এবং ঐশী অনুগ্রহে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত ইসলামি খিলাফত ব্যবস্থার মাধ্যমে পৃথিবীব্যাপী ক্রমান্বয়ে সম্প্রসারিত হয়ে চলেছে। অন্যথায় বাহ্যিক অর্থে 'আকাশ হতে নাযেল হওয়া', ক্রুশ ধ্বংস করা, শুকর বধ করা ইত্যাদি বিষয়গুলো অবাস্তব কেচ্ছা-কাহিনীরই নামান্তর। এই সকল বিষয়ের প্রকৃত ব্যাখ্যার সারাংশ নিম্নরূপঃ

❖ 'নযুল' বা 'নাযালা' শব্দটির দ্বারা আগমনের বিশেষ গুরুত্বকে বুঝানো হয়েছে। পবিত্র কুরআনে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর আবির্ভাবকেও 'নাযেল' বলে উল্লেখ করা হয়েছেঃ "কাদ আন্ যালাল্লাহু ইলায়কুম যিকরার রাসূলা"- অর্থাৎ 'নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি নাযেল করিয়াছেন এক স্মারক রসূল" (সূরা- তালাকঃ ১১-১২)। অন্যত্র বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'লা লোহা অবতীর্ণ করেছেন (সূরা হাদীদ)। 'তিনি পোষাক অবতীর্ণ করেছেন (সূরাঃ আ'রাফঃ ২৭)।

❖ ক্রুশ ধ্বংস করার অর্থ ত্রিত্ববাদী ক্রুশীয় মতবাদ ধ্বংস করা অর্থাৎ যীশু মানব-রসূল ছিলেন এবং তাঁর মৃত্যু হয়েছে, তা প্রমাণ করা। (সূরা কাহাফ, সূরা ইখলাস দ্রষ্টব্য)।

❖ শুকর বধ করার অর্থ শুকর-তুল্য নির্লজ্জতা এবং বদযবান-বিশিষ্ট লোকদিগকে আধ্যাত্মিক ভাবে ধ্বংস করা এবং দৃষ্টান্ত স্বরূপ কিছু কিছু লোকদেরকে 'মোবালাহা' দ্বারা লাঞ্ছিত ও ধ্বংস করা। (সূরা আল মায়েদা: ৬০-৬১)

❖ 'যুদ্ধ রহিতকরণ' দ্বারা শান্তিবাদী 'জামালী' তথা সৌন্দর্য ও আকর্ষণীয় শক্তির নীতির অনুসরণ এবং ধর্মের নামে যুদ্ধ রহিত করার পন্থাকে অর্থাৎ কলমের জিহাদ বুঝানো হয়েছে। (সূরা আল বাকারা: ২৫৭ এবং সূরা আন নাহল: ২৬, সূরা আল ফুরকান: ৫৩)।

❖ দাজ্জাল ও ইয়াজুজ-মাযুজ সম্পর্কিত ভবিষ্যবাণীর ব্যাখ্যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

হযরত প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহ্‌দী (আ.)–এর আগমন সম্পর্কেঃ

আহমদীয়া মুসলিম সম্প্রদায়ের বিশ্বাসের সঙ্গে অন্যান্যদের বিশ্বাসের পার্থক্য কি?

আহমদীয়া মুসলিম জামাতের চতুর্থ খলিফা হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.) বলেন:

"প্রথমতঃ আমি মসীহ্ (আ.)-এর আগমন সম্পর্কিত আমাদের বিরুদ্ধবাদী আলেমদের ধারণাটার একটি রূপরেখা পেশ করতে চাই। তারা বিশ্বাস করে যে, কুরআনে যে ঈসা ইবনে মরিয়ম (আ.)-কে ইসরাঈলীদের নবী বলা হয়েছে, তিনিই আসমান থেকে নেমে আসবেন এবং ইসলামের সকল শত্রুকে হত্যা করবেন। তাঁর এই বিশ্বজোড়া বিজয় অভিযানের মহান উদ্দেশ্য তিনটি। প্রথম উদ্দেশ্য: ক্রুশ ধ্বংস করা– আলংকারিক অর্থে নয়, একেবারে আক্ষরিক অর্থেই। খ্রিষ্ট-ধর্মের এই প্রতীকটির ধ্বংসের কাজ তিনি এমন প্রচণ্ড শক্তির সাথে সম্পন্ন করবেন যে, এর কোনও চিহ্ন পর্যন্ত তিনি অবশিষ্ট রাখবেন না। চার্চে, ঘরে বা গলার ঝুলানো– একটা ক্রুশও তখন আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য: তাঁর দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ কাজ হবে, তাদের মতে, শুকর নিধন করা, তা সে শুকর গৃহপালিতই হোক, আর বন্যই হোক। সুতরাং, তখন 'ক্রুশ' এর অনুসারীদের কাছে না থাকবে প্রার্থনা করার জন্যে কোন ক্রুশ, না খাবারের জন্য কোন শুকর ছানা। এতে করে, মসীহ্ (আ.) খৃষ্টানদেরকে শুধু আধ্যাত্মিক জীবন ধারণের সামগ্রী থেকেই বঞ্চিত করবেন না, বরং তাদেরকে দৈহিক পুষ্টিসাধনের জন্যে প্রয়োজনীয় খাদ্য থেকেও বঞ্চিত করবেন। তৃতীয় উদ্দেশ্য: তাদের মতে, মসীহ্ (আ.)-এর তৃতীয় কাজ হবে- দাজ্জালকে বধ করা। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে- কে এই দাজ্জাল? হাদীসের বর্ণনা গুলিকে যদি আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করা হয়, যেমনটা অনেকেই করে থাকেন, তাহলে সে হবে এক চক্ষু-কানা ও সুবিশাল দেহধারী। সে আসবে বিরাটকার এক গাধার পিঠে চড়ে এবং সে এত বেশী লম্বা হবে যে, তার মাথা মেঘ ভেদ করে যাবে। এই দাজ্জালের ফিৎনার বিরুদ্ধে সকল নবীই তাঁদের অনুসারীদেরকে সতর্ক করে গেছেন। এই দাজ্জাল যখন পৃথিবীতে ধ্বংসকাণ্ড চালাতে থাকবে, তখনই আকাশ থেকে নেমে আসবেন মসীহ্ (আ.)। তিনি দামেস্কের নিকটে দাজ্জালের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হবেন এবং তাকে হত্যা করবেন। অতঃপর, তিনি সারাটা জগৎ জয় করে নিবেন এবং এই কাজ সমাধা করেই তিনি পৃথিবীর শাসন ক্ষমতা তুলে দেবেন মুসলমানদের হাতে। সংক্ষেপে এটাই হচ্ছে, মুসলিম রাজনৈতিক পুনরুত্থান ও আধিপত্য লাভ সম্পর্কিত বিরুদ্ধবাদীদের দর্শন।' ('ধর্মের পুনরুজ্জীবনের দর্শন' নামক পুস্তক দ্রষ্টব্য)।

আহ্‌মদী মুসলমানের মতানুসারে সংশ্লিষ্ট ভবিষ্যদ্বাণীগুলোর প্রকৃত ব্যাখ্যাঃ

'আহ্‌মদী মুসলিম সম্প্রদায় যদিও মসীহ (আ.)-এর অবতরণ এবং মাহ্‌দী (আ.)-এর আবির্ভাব সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণীগুলোকে কোনভাবেই প্রত্যাখ্যান করে না, তবু তারা একটা বিষয়ের উপরে জোর দেয় যে, সেগুলিকে আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করাটা চরম সরলীকরণ মাত্র এবং তা অজ্ঞতারই পরিচায়ক। আমরা, আহমদী মুসলমানরা, বিশ্বাস করি যে, হযরত রাসূলে আকরাম মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর সু-উচ্চ মহিমান্বিত মর্যাদা পুরোপুরিভাবে অনুধাবন করতে না পারার কারণেই এরূপ মারাত্মক ভুল করা হয়েছে। ভুল করা হয়েছে তাঁর গম্ভীর ও দার্শনিক বাণীর মর্ম বুঝতে। অনুরূপ কোন গুরুত্ববহ বিষয়ের কথা বলতে গিয়ে অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন জ্ঞানী মানুষেরা প্রায় ক্ষেত্রেই, রূপক ও উপমার ব্যবহার করে থাকেন যেগুলির গুঢ় অর্থ ভাসা ভাসা দৃষ্টিতে ধরা পড়ে না।

আহমদী মুসলমানরা বিশ্বাস করে যে, প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) দাজ্জাল ও তার গাধা সংক্রান্ত গোটা বিষয়টাই রূপক, অলংকারিক। সুতরাং, এই প্রতিশ্রুত মসীহ্ সেই মসীহ্ নন যাঁকে প্রেরণ করা হয়েছিল ইসরাঈলীদের মধ্যে। আহমদীরা বিশ্বাস করে যে, ঈসা মসীহ্ (আ:) ক্রুশের নির্যাতন ভোগের বহু পরে স্বাভাবিক ভাবে মৃত্যুবরণ করেছেন। সুতরাং, ভবিষ্যদ্বাণীতে উল্লেখিত মসীহ (আ.), প্রকৃত প্রস্তাবে, অন্য এক ব্যক্তি, যাঁর জন্মগ্রহণ করার কথা ছিল রসূলে পাক মুহাম্মদ (সা.)-এর উম্মতের মধ্যে। ঈসা মসীহ্ (আ.)-এর বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলীর সঙ্গে তার কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলীর সাদৃশ্যের কারণে, তাঁকেও 'মসীহ্ ইবনে মরিয়ম' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে, যেমন একজন বড় নাট্যকারকে রূপকভাবে 'শেক্সপিয়ার' বলে আখ্যায়িত করা হয়।

'ক্রুশ' এর উল্লেখটাও রূপক বা উপমাসূচক। প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) আক্ষরিক অর্থে ক্রুশ ভঙ্গ করে বেড়াবেন না। তিনি শক্তিশালী যুক্তিতর্ক ও অকাট্য দলীল-প্রমাণ দিয়ে ক্রুশ-ভিত্তিক খৃষ্টধর্মকে পরাস্ত করবেন। সুতরাং 'ক্রুশ' এর ধ্বংসসাধন হচ্ছে আদর্শগতভাবে খৃষ্টধর্মের উচ্ছেদসাধন।

একইভাবে, 'শুকর' কথাটাও আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করা ঠিক নয়। এই শব্দটি দিয়ে

পাশ্চাত্য জগতের সাংস্কৃতিক নষ্টামী ও নোংরামীর কথাই ব্যক্ত করা হয়েছে,– যার দরুণ মানুষ পরিণত হয়েছে পশুতে। আমেরিকা ও ইউরোপে যৌন অরাজকতার যে অবাধ লীলা বয়ে চলেছে, তাই প্রকাশ করা হয়েছে 'শুকর' শব্দটি ব্যবহারের মাধ্যমে। এর দ্বারা সেই অতিশয় জঘন্য লাম্পট্যের দিকেই ইংগিত করা হয়েছে, মাসুম শিশুরা পর্যন্ত যার শিকারে পরিণত হচ্ছে। ঐ হাদীসে নিশ্চয় এই কথা বলা হয়নি যে, মসীহ্ (আ.) বন্য শুকরের পালগুলোর পিছনে পিছনে ধাওয়া করবেন এবং সেগুলিকে বার বার হত্যা করবেন। এই অহেতুক ও অস্বাভাবিক কাজের চিত্রটা খোদা-তা'লার একজন নবীর জন্য নিতান্তই একটি উদ্ভট ও বিশ্রী ব্যাপার। এটা বরং গ্রীক পৌরাণিক কাহিনীর 'অ্যাজাক্স' নামক সেই বীরের কথাই মনে করিয়ে দেয়, যে গরু-মহিষ ও মেষপালের সবগুলো পশুকে কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলতো, এই উম্মত্ত বিশ্বাসে যে, এগুলি সব গ্রীক সেনাবাহিনীর প্রধান প্রধান সেনা অফিসার।

'ক্রুশ' ও 'শুকর' এবং 'মসীহ্' শব্দগলির মত 'দজ্জাল' শব্দটিও প্রতীক বা রূপক। দাজ্জাল হচ্ছে সেই বিরাট শক্তিশালী জাতির প্রতীক, যে জাতি কেবল পৃথিবীতেই শাসন চালায় না, মহাশূন্যেও শাসন চালায়। ক্রুশ ও শুকর, বস্তুতঃ এই জাতীরই প্রতীক চিহ্ন। হাদীসে বলা হয়েছে, দাজ্জালের ডান চক্ষু কানা হবে, কিন্তু বাম চক্ষু হবে উজ্জ্বল ও বড়। এটাও রূপক বর্ণনা, যার প্রকৃত অর্থ- এই জাতিটার আধ্যাত্মিক চক্ষু দৃষ্টিহীন হবে, কিন্তু বস্তুবাদী দৃষ্টি হবে অত্যাধিক প্রখর। এরা আধ্যাত্মিক আলো থেকে বঞ্চিত থাকবে, তবে এদের দুনিয়াদারী ও পার্থিব অন্তদৃষ্টি হবে অতীব প্রখর এবং এ কারণেই এদের পার্থিব উন্নতিও হবে অপরিমেয়।

শেষে আসে দাজ্জালের বিরাটাকার গাধার কথা। আহমদী মুসলমানরা দাজ্জালের গাধাকেও মনে করে প্রতীক। এই প্রতীকটির সাহায্যে প্রকাশ করা হয়েছিল ভবিষ্যতের যানবাহন ব্যবস্থার কথা। এই গাধার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে যেসব বর্ণনা দেয়া হয়েছে, তার সবটাই, বিনা ব্যতিক্রমে, পাশ্চাত্যের আবিষ্কৃত জ্বালানী-চালিত যানবাহনগুলোর সাথে হুবহু মিলে যায়। এই গাধার যে বিবরণ হাদীসে উল্লেখ করা আছে, –তাতে আছে যে, এই গাধা আগুন খাবে, যমীনের উপরে চলবে, সাগর পাড়ি দেবে, বাতাসের উপর দিয়ে বিচরণ করবে। এই গাধা এত দ্রুত গতিতে চলবে যে, কয়েক মাসের রাস্তা কয়েক ঘন্টার অতিক্রম করবে। লোকেরা তার পিঠের উপরে না চড়ে তার পেটের ভিতরে চড়ে ভ্রমণ করবে এবং তাদের পেটের মধ্যে বাতি জ্বলবে। সে তার যাত্রা শুরুর সময় ঘোষণা করবে এবং এর দ্বারা যাত্রীদেরকে তাদের আসন গ্রহণ করতে বলবে। ভবিষ্যতে ঘটিতব্য এই বিষয়গুলোর বর্ণনাসমূহ আধুনিক যুগের যানবাহনগুলোর মাধ্যমে এরূপ বিস্ময়কর ও সঠিকরূপে পূর্ণ হয়েছে যে, এতে হযরত রসুল পাক মুহাম্মদ (সা.)-এর সত্যতাই সমুজ্জ্বলভাবে প্রমাণীত হয়েছে।

আহ্‌মদীয়া মুসলমানদের ধারণা মতে ইমাম মাহদীর আবির্ভাব সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীগুলিও রূপক। তিনি যে সম্পর্দ বিতরণ করবেন মুসলমানদের মধ্যে তা হচ্ছে আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও প্রজ্ঞার সম্পদ, তা পার্থিব নয়। বর্ণিত হয়েছে, এই সম্পদ বেশী করে গ্রহণ করতে কেহ কেহ অস্বীকার করবে। এতেই বুঝা যায়, এটা কি ধরণের সম্পদ হবে। কেননা, মানুষ যতই পায় আরও চায়। সে তো কখনই পার্থিব সম্পদ লাভে পরিতৃপ্ত হয় না। বরং, আরও পেতে চায়। কেবলমাত্র, আধ্যাত্মিক সম্পদকেই মানুষ অবজ্ঞা ভরে প্রত্যাখ্যান করে থাকে।

কাজেই ইসলামের অন্যান্য ফের্কাগুলো ইসলামী রেঁনেসার যে দর্শনে বিশ্বাস করে, – যেমনটা আলোচনা করা হলো,– এবং যা তারা প্রচার করে থাকে, আহমদীয়াত তাকে অযৌক্তিক ও বাতিল মনে করে। আহ্‌মদীয়ত মনে করে যে, এই প্রকারের দর্শন শুধু যে কুরআনী শিক্ষার প্রকৃত অভিপ্রায়ের পরিপন্থী তাই নয়, বরং তা নবীগণের ইতিহাসের সাথেও সামঞ্জস্যহীন। সর্বোপরি, এটা হযরত রসূলে আকরাম (সা.)-এর প্রদর্শিত সুন্নাহ্‌রও ঘোর পরিপন্থী। আহ্‌মদীয়াত ঐ জাতীয় আদর্শিক মাদকতাকে প্রত্যাখ্যান করে, যা কিনা জাতিসমূহকে অকর্মণ্যতার মধ্যে ঠেলে দিয়ে তাদেরকে পরিচালিত করে- বানোয়াট-বিশ্বাস, দিবা-স্বপ্ন ও কল্পকাহিনীর জগতে।

ধর্মের পুনরুজ্জীবন সম্পর্কে আহ্‌মদীয়া দর্শনের মূলকথা হলো এই যে, প্রতিটি ধর্মের সাধারণ যে উত্তরাধিকার, তা থেকে আহ্‌মদীয়া দর্শন আলাদা কিছু নয়। এটাই একমাত্র দর্শন যা ইতিহাস সমর্থিত। যদিও ধর্মীয় গ্রন্থাদি এবং পৌরানিক কেচ্ছা-কাহিনীতে পাওয়া যায় যে, কেউ কেউ ভিন্ন ভাবে (সশরীরে) আকাশে বা স্বর্গে উঠে গেছেন, তথাপি সুদীর্ঘ অনুপস্থিতির পর আকাশ বা স্বর্গ থেকে কেউ সশরীরে ফিরে এসেছেন- এমন দৃষ্টান্ত বা বিবরণ আদম (আ.) থেকে আজ পর্যন্ত একজনের ক্ষেত্রেও পাওয়া যায়নি।" ('ধর্মের পুনরুজ্জীবনের দর্শন' পুস্তক থেকে সংকলিত)।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইমাম মাহ্‌দী ও মসীহ মাওউদ (আ.) বলেছেন:

❖ "এই যুগটা ছিল মসীহার আগমনের যুগ। এটা অন্য কারো যুগ ছিল না। আমি যদি না আসতাম তবে অন্য কেউ অবশ্যই আসতো।"

❖ "সুতরাং হে সত্যানুসন্ধিৎসুগণ! তোমরা ভেবে দেখ, ইহাই কি সেই সময় নহে, যখন ইসলামের জন্য আসমানী সাহায্যের আবশ্যকতা অনুভূত হচ্ছে?" *(আয়ানায়ে কামালাতে ইসলাম: ২৫১ পৃ.)*

[চলবে]

আহমদীয়া মুসলিম জামাতে বয়আত (দীক্ষা) গ্রহণের পর আমি কি পেলাম!

খন্দকার মাহবুব উল ইসলাম, প্রেসিডেন্ট, রংপুর

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন, "যখন তোমরা মাহদীর সন্ধান পাবে তাঁর হাতে বয়আত করবে। যদি বরফের উপর হামাগুড়ি দিয়েও যেতে হয়, নিশ্চয় তিনি আল্লাহ্‌র খলীফা আল-মাহদী" *(সুনানে ইবনে মাজা বাব খুরুজুল মাহদী)*।

তাঁর (সা.) নির্দেশানুসারে এ যুগে আগত আল্লাহ্‌র খলীফা ইমাম মাহদী (আ.)-এর জামাতে বয়আত গ্রহণের পরে শরীর ও মন এক অনাবিল আনন্দে ভরে গেল। পবিত্র কুরআনের অপার সৌন্দর্য মণ্ডিত শিক্ষা ও মহানবী (সা.)-এর মহান আদর্শ থেকে দূরে সরে যাওয়ার কারণে মুসলমানরা অধঃপতনের চরম গহবরে নিপতিত হয়েছে। তাদেরকে হারানো ঈমান ও আমলের উপর পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার জন্যই হযরত ইমাম মাহদী (আ.), হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর আরেক পবিত্র নাম 'আহমদ' নামানুসারে আহমদীয়া মুসলিম জামাত কায়েম করেছেন। তো এই জামাতে প্রবেশ করে প্রতিনিয়ত পবিত্র কুরআনের প্রকৃত শিক্ষা ও মহানবী (সা.)-এর আসল আদর্শের সঙ্গে যতই পরিচিত হচ্ছিলাম ততই মনের মধ্যে আনন্দ ও প্রশান্তি অনুভব করছিলাম। প্রিয় পাঠক, সেই আনন্দ অনুভূতির কিছু বর্ণনা আপনাদেরকে শোনাব।

প্রথমে অপেক্ষা করছিলাম পবিত্র জুমুআর নামাযের জন্য। বয়আত গ্রহণের তিন দিন পরে শুক্রবার। মনের মধ্যে সাজ সাজ রব। জীবনে এই প্রথম আল্লাহ্‌র মনোনীত জামাতে জুমুআর নামাজ আদায় করব। অনেক আগ্রহ নিয়ে জুমুআর নামাযে হাজির হলাম। প্রথমেই বিস্ময়কর চমক। আযানের পরে তাশাহুদ, তাঊয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পরে ইমাম সাহেব বাংলায় খুতবা প্রদান শুরু করেছেন। পবিত্র কুরআন ও হাদীসের আলোকে পাঁচ বেলার নামায কেন বাজামাত নিয়মিত আদায় করতে হবে, মহান আল্লাহ্‌র পাক কালাম কুরআন মজীদ কেন নিয়মিত তেলাওয়াত করতে হবে তা সুন্দর করে বুঝিয়ে দিচ্ছেন। সহজ ও সাবলীল ভাষা হওয়ার কারণে মনোযোগ দিয়ে শুনছিলাম আর চিন্তা করছিলাম জীবনে এই প্রথম খুতবা শুনে স্বাদ পাচ্ছি। ইতিপূর্বে অ-আহমদী অবস্থায় জুমুআর খুতবা শুনেছি, সেখানে তো আরবীতে খুতবা প্রদানের একটা নির্ধারিত বই থাকে, সেই বই থেকে ইমাম সাহেব আরবীতে খুতবা প্রদান করেন। সেই আরবী খুতবা কোন মুসল্লীর পক্ষেই বুঝা সম্ভব নয়। খুতবা যদি মানুষ বুঝতে না পারে তাহলে মানুষের মধ্যে পবিত্র পরিবর্তন কি ভাবে সম্ভব ? আর অহেতুক কর্ম কখনো ইসলাম সম্মত হতে পারে না। সে সময়ে মনে হত খুতবা বাংলায় হওয়া উচিত। কারণ ইসলাম প্রকৃতি সম্মত ধর্ম, যুক্তির ধর্ম। জুমুআর গুরুত্ব তো সে কারণে যেন গত ৭ দিনে মুসল্লীদের মধ্যে যে দূর্বলতা সৃষ্ঠি হয় ইমাম সাহেব সেগুলি চিহ্নিত করে কুরআন ও হাদীসের আলোকে খুতবার (বক্তৃতার) মাধ্যমে তা দূর করার চেষ্ঠা করেন। এ জন্য যোহরের নামাযের চার রাকাত ফরজের পরিবর্তে জুমুআর নামাজে তা কমিয়ে দুই রাকাত করা হয়েছে, আর দুই রাকাত ফরজ নামাজের পরিবর্তে মনোযোগ দিয়ে খুতবা শোনা আবশ্যক করা হয়েছে। এখন তো খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর মর্মস্পর্শী ও হৃদয়গ্রাহী খুতবা সমূহ সারা বিশ্বব্যপী ইমাম সাহেবরা মসজিদে মসজিদে স্ব স্ব আঞ্চলিক/ জাতীয় ভাষায় জুমুআর নামাজে পাঠ করে শোনান। পবিত্র কুরআন হাদীসের আলোকে ঈমান উদ্দীপক এই সমস্ত খুতবা মাতৃভাষায় উপস্থাপনের কারনে মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় গভীর মমতা নিয়ে শুনি, ফলে মনের মরিচা দূর হয়, পাপাসক্ত জীবন আল্লাহ্‌ এবং মহানবী (সা.)-এর ভালবাসায় কাণায় কাণায় পূর্ণ হয়। খুতবায় প্রাণপ্রিয় খলীফা কখনো ইসলামের প্রথম যুগের সাহাবা (রা.)-দের আল্লাহ্‌র খাতিরে অবর্ণনীয় দুঃখ কষ্ট ভোগ করার করুন ইতিহাস তুলে ধরেন, কখনো ইসলামের জন্য তাদের (রা.) অকাতরে জীবন বিসর্জন দেয়ার বেদনাদায়ক ঘটনা বর্ননা করেন, আর কখনো রসূলুল্লাহ (সা.)-এর নির্দেশানুসারে ইমাম মাহদী (আ.)-এর মান্যকারী আহমদী মুসলমানরা সারা বিশ্বব্যাপী,

বিশেষ করে পাকিস্তানে, কত নির্দয়ভাবে ধর্মান্ধ মৌলভী/সন্ত্রাসীদের দ্বারা শাহাদত বরণ করেছে, তার মর্মস্পর্শী চিত্র তুলে ধরেন, যা শুনে চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠে। হুজুর (আই.)-এর সময়োপযোগী এই সমস্ত খুতবা এত গভীর প্রজ্ঞা সমৃদ্ধ, এত আকর্ষণীয় হয় যে তার একটা লাইন একটা শব্দ শোনা থেকে বঞ্চিত হলে নিজেকে অপরাধী মনে হয়। মায়ের ভাষায় খুতবা শুনতে পেয়ে আমরা মৃতরা আবার জীবত হয়ে উঠি।

কিছুদিন পরে এলো মাহে রমযান। সাবেক প্রসিডেন্ট জনাব খন্দকার আজমল হক সাহেব এবং মরহুম আহমদ তৌফিক চৌধুরী সাহেব (সাবেক ন্যাশনাল আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ) বাদ আছর প্রতিদিন পবিত্র কুরআনের উপরে দরস দিতেন। তাদের যুক্তি ও বিজ্ঞান ভিত্তিক কুরআনের দরস শুনে মনে হত আমি এক নূতন পৃথিবীতে জন্ম নিলাম। ধর্মান্ধ মৌলভীরা পবিত্র কুরআনকে রুপকাহিনীর গ্রন্থ বানিয়ে নিয়ে অর্থ উপার্জনের একটা হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করছে। ইসলামের নেতৃত্ব দেয়ার দাবীদারদের অন্ধ বিশ্বাস ও গোড়ামীর কারণে তাদেরকে আমি প্রচণ্ডভাবে ঘৃণা করতাম। কিন্তু পবিত্র কুরআন, ইসলাম ও মহানবী (সা.)-কে গভীরভাবে ভালোবাসতাম। আমি শতভাগ নিশ্চিত ছিলাম একদিন ইসলামের এই দূরাবস্থা দূরীভূত হবে, পবিত্র কুরআনের প্রকৃত শাশ্বত সুন্দর শিক্ষাকে আল্লাহ্ তা'লা অবশ্যই জগতে কায়েম করবেন। এই জামাতে প্রবেশ করে সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নের শতভাগ নিশ্চয়তা পেয়ে গেলাম। পবিত্র কুরআনের শিক্ষা যে এত সুন্দর, এত মহিমান্বিত, এত উন্নত, এত আধুনিক, প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.)-এর উসিলায় তা জেনে মনে হল গোটা পৃথিবীর ধনভাণ্ডার আমি হাতের মুঠোয় পেয়ে গেছি। ধন্য, শত সহস্র ধন্যবাদ প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহদী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)-কে যিনি পবিত্র কুরআনকে ঐশী বাণীর অমূল্য ভাণ্ডার হিসাবে দুনিয়ার সামনে উপস্থাপন করেছেন। তাঁর (আ.)-এর পঞ্চম খলীফা হযরত মির্যা মসরুর আহমদ (আই.) জুমুআর খুতবার মাধ্যমে, জলসায়, সেমিনারে, শান্তি সম্মেলনে বক্তৃতার মাধ্যমে সেই অমূল্য ভাণ্ডারকে জগৎ ব্যাপী ছড়িয়ে দিচ্ছেন। মুসলিম টেলিভিশন আহমদীয়ার এমটিএ-এর মাধ্যমে তা অহোরাত্র সম্প্রচারিত হচ্ছে। পিপাসার্ত মানুষ ঐশী খিলাফতের প্রস্রবন থেকে পান করে পরিতৃপ্ত হয়ে নিজেদের জীবনকে ধণ্য করছে। হতভাগারা তা থেকে নিজেদেরকে বঞ্চিত রেখে ধূকে ধূকে মরছে।

ঐশী প্রস্রবন থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখার কারণে অর্থাৎ হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-কে না মানার কারণে হতভাগারা যে কতভাবে নিজেদেরকে, নিজেদের পরিবার পরিজনকে যুলুমের শিকারে পরিনত করছে তার ইয়াত্তা নাই। আমি অল্প কিছু নমুনা উপস্থাপন করছি।

১) পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ্ বলেছেন, "(তোমরা রোযা রাখবে) নির্দিষ্ট কয়েক দিন মাত্র। তবে তোমাদের মাঝে যে অসুস্থ অথবা সফরে আছে তার ক্ষেত্রে অন্যান্য দিনে (রোযার) সংখ্যা পূর্ণ করা বিধেয়। আর যারা এর সামর্থ্য রাখে না তাদের জন্য ফিদিয়া (রূপে) একজন দরিদ্রকে খাওয়ানো (বাধ্যতামূলক করা হল)"। *(সূরা আল বাকারাহ: ১৮৫)*

"অতএব তোমাদের মাঝে যে এ মাসকে পাবে সে যেন এতে রোযা রাখে। কিন্তু যে অসুস্থ অথবা সফরে থাকে তাকে অন্যান্য দিনে (রোযার এ) সংখ্যা পূর্ণ করতে হবে। আল্লাহ্ তোমাদের জন্য স্বাচ্ছন্দ্য চান এবং তোমাদের জন্য কাঠিন্য চান না"। *(সূরা আল বাকারাহ: ১৮৬)*

অসুস্থ অথবা সফরে থাকাকালীন সময়ে রোযা থাকা খুব কষ্টকর হবে, কঠিন হবে বিধায় পরম দয়াময় মহান আল্লাহ্ পর পর দুইটি আয়াতে তা করতে নিষেধ করেছেন। অথচ মহান আল্লাহ্‌র সুস্পষ্ট হুকুম অমান্য করে অ-আহমদীরা অনেক সময় অসুস্থ অবস্থায় রোযা থাকে, আর সফর অবস্থায় তো হর হামেশাই রোযা থাকে। একবার এক অসুস্থ গ্রাম্য মহিলাকে গ্রাম্য ভাষায় বলতে শুনেছি 'মুই রোযা নিয়া মরিম '(আমি রোযা পালন রত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করব) অর্থাৎ অসুস্থ অবস্থায় রোযা রেখে সে মারা যাবে তবুও ঔষধ খাবে না বা রোযা ভাঙ্গবে না। এই হল আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট করার তথাকথিত পদ্ধতি।

সফরে রোযা থাকা নিয়ে যে কত ডামাডোল শুরু হয় তা বিজ্ঞ পাঠক মাত্রই অবগত আছেন। রাস্তায় বাস ট্রেন থামিয়ে ইফতার ও সেহেরী পর্ব শুরু হয়। রাস্তার এসব খাবার নিম্নমানের হলেও চড়া দামে বিক্রি করা হয়। কত মানুষ কত ভোগান্তিতে পড়েন। আল্লাহ্‌র নিষেধ অমান্য করাই তো পাপ। আর পাপের ফল স্বরূপ বান্দার ভয়াবহ পরিণতি হতে বাধ্য। এ যুগের মামুর মিনাল্লাহ হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-কে গ্রহণ করার কারণে আহমদী মুসলমানরা সঠিকভাবে কুরআনকে বুঝতে শিখেছে এবং সেই অনুযায়ী তারা পবিত্র কুরআনের হুকুমের উপরে যথাযথ ভাবে আমল করার সক্ষমতা অর্জন করেছে অর্থাৎ আহমদী মুসলমানরা অসুস্থ ও সফর অবস্থায় রোযা না রেখে বরং অন্য সময় সেই কমতি পূর্ণ করে মহান আল্লাহ্‌কে খুশী করার চেষ্টা করে।

একমাস রোযা পালন শেষে আসে পবিত্র ঈদুল ফিতর। প্রতি বাড়ি বাড়ি ঘুরে ফকীর মিসকিনরা ফিতরানা আদায় করে বেড়ান। অনেক গরীব আছে যারা অনাহারে থাকলেও কারো কাছে হাত পাতবেন না। ঈদ উপলক্ষ্যে সামর্থবানরা যাকাত প্রদান করার ঘোষণা দেয়ার সাথে সাথে তাদের বাড়িতে শত সহস্র ফকীর মিসকিনের সমাবেশ ঘটে। অনেক সময়

অব্যাবস্থাপনার কারণে পদপিষ্ট হয়ে কত অসহায় পুরুষ, নারী ও শিশুর মৃত্যু ঘটে বিজ্ঞ পাঠক মাত্রই তা অবগত আছেন।

আহমদীয়া মুসলিম জামাতে খিলাফত ব্যবস্থা বিদ্যমান থাকায় প্রতিটি সদস্য/সদস্যা বায়তুল মালে ফিতরানা এবং সামর্থবানরা ফিতরানা, ফিদিয়া ও যাকাত প্রদান করেন। এরপরে প্রতিটি অসহায়, অস্বচ্ছল ও অভাবী নারী/পুরুষের তালিকা প্রণয়ন পূর্বক ঈদের পূর্বেই যুগ খলীফার পক্ষ থেকে মূল্যবান উপহার সামগ্রী (নগদ টাকা, খাবার ও কাপড়-চোপড়) নিয়ে প্রতেকের ঘরে ঘরে যেয়ে অত্যন্ত সম্মানের সাথে তা সবার হাতে তুলে দেয়া হয়। পবিত্র ঈদুল আজহিয়ায় একই নিয়মে কুরবানীর গোস্ত বিতরণ করা হয়।

প্রিয় নবী (সা.) বলেছেন, "যে পিতা তার তিন কন্যাকে তালিম তরবিয়তের মাধ্যমে লালন পালন করে যথাসময়ে বিবাহ দেয় সে অবশ্যই জান্নাতের অধিকারি হবে।" অ-আহমদী সমাজে কন্যাকে পাত্রস্থ করা যে কত কঠিন তা ভুক্তভোগী ছাড়া আর কেউ জানে না। অ-আহমদীরা সবাই কোন না কোন জামাতের অধীন অথবা পীরের মুরীদ। তা সত্বেও একটি বিয়ে কি যৌতুক ছাড়া হয়? হয়ত বা হয়। তাহলে যৌতুক ছাড়া একটা বিয়ের ঘটনা শুনুন।

বাবা না থাকা এক মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন মা। বাবা নাই এজন্য মা বিয়ের আগেই বরপক্ষকে জানিয়ে দিয়েছেন তার পক্ষে যৌতুক দেয়া সম্ভব নয়। শর্তে রাজী হয়েই বর বিয়ের পিড়িতে বসেছে। কিন্তু এখন মেয়েকে উঠিয়ে নিচ্ছে না। শর্তের কথা স্মরণ করালে পাত্র পক্ষ বলল, যৌতুক নাই ঠিক আছে, তাই বলে কি সামাজিকতাও নাই? সামাজিকতা কি জানতে চাইলে বলল কমপক্ষে রঙ্গীন টিভি, ফ্রিজ, মোটর সাইকেল, ঘরের আসবাবপত্র এবং বর কনে সাজানো। যৌতুকের ভয়াবহ অভিশাপ ও তথাকথিত সামাজিকতার বিষাক্ত ছোবলে প্রতি নিয়ত কত তরুণী, কত যুবতীর জীবন হচ্ছে দুর্বিষহ, শরীর হচ্ছে রক্তাক্ত, প্রাণ বলি হচ্ছে শত শত। মনে হচ্ছে এর কোন শেষ নাই। তিলে তিলে গড়া অনেক আদরের কন্যার মুখের দিকে তাকিয়ে ভিটে মাটি সব বিক্রি করে যৌতুকের টাকা তুলে দেন জামাইয়ের হাতে। যেন মেয়েটা সুখে থাকে, শান্তিতে থাকে। কিন্তু কসাইরূপী বরের চাহিদা আরো বেড়ে যায়। বাড়তি চাহিদা পূরণ করতে না পারায় অসহায় এই মেয়েটিকে প্রহারে প্রহারে নির্মম ভাবে হত্যা করা হয়। শেষে আত্মহত্যার কথা বলে চালানো মেয়ের লাশ নিয়ে ঘরে ফেরেন দুঃখী সর্বশান্ত বাবা। প্রতিদিন পত্রিকার পাতায় পাতায় এই সব খবর পড়ে শরীর শিউরে উঠে, চোখ অশ্রুসিক্ত হয়।

মহান আল্লাহ্‌র অসীম দয়ায় হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-কে মান্যকারী সারা বিশ্বব্যাপী আহমদীয়া মুসলিম জামাতের সদস্য/সদস্যরা যৌতুকের এই ভয়াবহ অভিশাপ থেকে মুক্ত। এটা কোন মৌখিক বুলি সর্বস্ব কথা নয়। একশত ভাগ ব্যবহারিক সত্য। আমরা নিজেরা এর সত্যায়নকারী। আমরা তিন ভাই আহমদীয়া মুসলিম জামাতে বয়আত গ্রহণের পরে যৌতুক ছাড়া বিবাহ করি। আমাদের তিন বোন ও এক মেয়ের পুরো পুরি যৌতুক ছাড়া বিবাহ হয়। এভাবে সারা বিশ্বের সকল আহমদী মুসলমান যৌতুক ছাড়া বিবাহ করেন এবং বিবাহ দেন। আল্লাহ্‌র ফযলে তারা সবাই একথার সাক্ষী ও সত্যায়নকারী। কোন কন্যা দায়গ্রস্ত পিতা যদি অক্ষম হন, তাহলে স্থানীয় জামাত তার ব্যবস্থা করবে, নতুবা ন্যাশনাল জামাত ব্যবস্থা করবে, নতুবা আন্তর্জাতিক জামাতের যিনি প্রধান হযরত আমীরুল মোমেনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) তাঁর প্রতিনিধির মাধ্যমে ব্যবস্থা করবেন। মহানবী (সা.)-এর যামানায় যে অনিন্দ সুন্দর সমাজ কায়েম হয়েছিল প্রতিশ্রুত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর যামানায় আবার নতুন করে সেই সুন্দর সমাজ ব্যবস্থা কায়েম হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ।

মহান আল্লাহ্‌ পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেছেন "প্রতিটি প্রাণীকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে"। যদিও এই অমোঘ বিধান চিরন্তন, তথাপি যে পরিবারে উপার্জনক্ষম কারো মৃত্যু হয় সে পরিবারকে সাময়িক সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়। এর উপরে যদি সেই শোকগ্রস্ত পরিবারকে মৃতের রূহের মাগফিরাতের জন্য জোত-জমি, ঘটি-বাটি বিক্রি করে হলেও গরু খাসি জবাই করে সমাজের সবাইকে খাওয়ানোর বোঝা চাপানো হয়, তাহলে তাকে 'মরার উপরে খাড়ার ঘাঁ' ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে। কূলখানি, চল্লিশা, বছরকির এই উৎসব, ধর্মীয় আবরণে মৃত ব্যক্তির আত্মার প্রতি চরম পরিহাস ভিন্ন আর কি? আবার তথাকথিত এই শোক উৎসবের খাওয়ানো নিয়ে যদি একটু কম বেশী হয়, দাওয়াত দিতে যেয়ে ভুলে সমাজের/গ্রামের কেউ বাদ পড়ে যায় তাহলে তো কথায় নেই, শোকগ্রস্ত ঐ পরিবারের চৌদ্দ গুষ্টি উদ্ধার করে ছাড়া হয়। আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন **"মানুষ মৃত্যু বরণ করার সাথে সাথে তার আমল বন্ধ হয়ে যায়। তবে তিনটি আমল তখনো জারী থাকে। সে তিনটি হচ্ছেঃ সদকায়ে জারীয়া, অথবা এমন ইলম যা থেকে লাভবান হওয়া যায়, অথবা এমন সুসন্তান যে তার জন্য দোয়া করে।"** (মুসলিম)

আহমদীয়া মুসলিম জামাতের সদস্যরা মহানবী (সা.)-এর সুন্নত পরিপন্থী সামাজিক এই সমস্ত কুপ্রথা যথা কূলখানী, চল্লিশা, বছরকি/মৃত্যু বার্ষিকীর ভোজ উৎসব থেকে সম্পূর্ণ রূপে মুক্ত। রসূল করীম (সা.)-এর হাদীস অনুসারে মৃত ব্যক্তির জন্য তার সুসন্তান দোয়া করে। তথাকথিত ভোজ/মজলিস করা নিয়ে

অযথা যন্ত্রণা/মাথা ব্যথার পরিবর্তে শোক পালনের জন্য তিনদিন শোকসন্তপ্ত পরিবার স্থানীয় জামাতের মাধ্যমে খাবার ও অন্যান্য সহযোগিতা পেয়ে কিছুটা হলেও স্বস্তি অনুভব করে। শোকসন্তপ্ত পরিবারকে স্থানীয় আহমদীয়া মুসলিম জামাত সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করার জন্য সব সময় তৎপর থাকে।

স্নাতক পর্যায়ে পড়ার সময় এক বাড়ির তিন জন ছেলে মেয়েকে পড়ানো শুরু করি। হঠাৎ একদিন শুনি ঐ বাড়ির গৃহকর্তাকে দুষ্ট জ্বীন আছর করেছে। কি মুসিবৎ। জ্বিন তাড়ানোর জন্য অন্ধকার রাতে কবিরাজ এলেন। দরজা জানালা বন্ধ অন্ধকার ঘরে শুধু বয়স্ক কবিরাজ আর জ্বীনে ভর করা নারী। প্রতিবেশীরা গভীর কৌতুহল নিয়ে বাইরে অপেক্ষা করছিল। আমি কবিরাজের শয়তানী পর্যবেক্ষণ করার জন্য সুযোগ খুঁজছিলাম। (আমি তখন অ-আহমদী এবং এসব অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারের ঘোর বিরোধী ছিলাম)। যাই হোক কবিরাজ তার তথাকথিত ক্ষমতাবলে কিছুক্ষণের মধ্যেই ঝম ঝম শব্দ করে জ্বিন হাজির করালেন। বিরক্তিভরা কণ্ঠে মিহি গলায় জ্বিন বলল, কেন আমায় ডাকা হয়েছে। কবিরাজ বলল কেন তুই এই নারীর উপরে ভর করেছিস? মাথার চুল খোলা রেখে গাছের নীচে দাঁড়িয়েছিল বলেই আমি তার উপরে ভর করেছি, জ্বিন বলল। কবিরাজ তাকে ধমক দিয়ে বলল, তুই এই নারীকে ছেড়ে চলে যা নতুবা বোতলে বন্দী করে রাখব। বেশ কিছু ভোগ সামগ্রীর আশ্বাস পেয়ে জ্বিন নারীকে ছাড়তে রাজী হল। ছেড়ে যাওয়ার প্রমাণস্বরূপ সে বাড়ির অদূরে নির্দিষ্ট একটা গাছের ডাল ভেঙ্গে রেখে গেল। কিছুক্ষণ পরে ঐ গাছের কাছে যেয়ে দেখা গেল, গাছের ডাল ভাঙ্গা অবস্থায় নিচে পড়ে আছে। সবাই স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। জ্বিন তাড়ানো ফী এবং জ্বিনকে দিতে চাওয়া ভোগ সামগ্রী নিয়ে খুশী মনে কবিরাজ ঘরে ফিরে গেল। আমি গৃহকর্তাসহ বাড়ির সবাইকে বুঝানোর চেষ্টা করলাম যে এসবই হল কবিরাজের চালাকি। তথাকথিত জ্বিন তাড়ানোর নাটক করে মানুষকে বোকা বানিয়ে অর্থ উপার্জনের ফন্দি। তারা কিছুতেই আমার কথা বিশ্বাস করল না। আমি ছাত্রীকে দিয়ে ওদের হাত ঘড়িটা চুপ করে আনালাম। ঘড়ি হারানোর কথা কবিরাজকে জানানো হল। কবিরাজ বলল, জ্বিনের ভোগের মান নিম্নমানের হয়েছে, যার ফলে রাগ করে সে ঘড়িটা নিয়ে গেছে। আমি কবিরাজের কথাকে মিথ্যা প্রমাণ করার জন্য সবাইকে ঘড়িটা দেখালাম এবং বললাম, এভাবেই পিশাচের মত এসব কবিরাজ, ফকীর ও একশ্রেণীর পীর– জ্বিন, ভূত প্রেত, পেত্নী তাড়ানোর নাম করে টাকা কামাই করে, কখনো তাবিজ কবজ দিয়ে রোগ-বালাই, বিপদ-আপদ, মুসিবৎ দূর করার নামে অর্থ হাতিয়ে নেয়। এদের পাল্লায় পড়ে কত মানুষ কতভাবে যে সর্বশান্ত হচ্ছে তার ইয়াত্তা নেই।

ইমাম মাহদী (আ.)-কে অস্বীকার করার কারণে এদের স্বাভাবিক জ্ঞানবুদ্ধি পর্যন্ত লোপ পেয়েছে। ফলে এই সমস্ত টাউট বাটপাড়দের সহজ স্বীকারে পরিণত হয় এরা। জ্বিন-ভূত তাড়ানোর নামে রোগীকে বিশেষ করে কিশোরী, তরুণী মেয়েদেরকে মারতে মারতে এরা অজ্ঞান করে ফেলে। চরম বর্বরতার কারণে হতভাগারা অনেক সময় মারা যায়। এই অপচিকিৎসকেরা বলে, এই প্রহার নির্যাতন তো রোগীর গায়ে লাগে না, জ্বিন-ভূতের গায়ে লাগে। হতভাগ্য রোগীর নির্বোধ অভিভাবকেরা টাউট ফকীর, কবিরাজের কথা খুশী মনে মেনে নেয়। গ্রাম গঞ্জে প্রতিনিয়ত এইসব বেদনাদায়ক ঘটনা ঘটে চলেছে।

পবিত্র কুরআন করীম অনুযায়ী জ্বিন আগুনের তৈরী অর্থাৎ অগ্নি স্বভাব বিশিষ্ট মানুষকে জ্বিন বলা হয়েছে, আর 'ইনস' (মানুষ) মাটির তৈরী অর্থাৎ মাটির মত নরম ও নম্র স্বভাব বিশিষ্ট মানুষকে বলা হয়েছে।) প্রতিশ্রুত মসীহ মওউদ ও ইমাম মাহদীকে (আ.) মানার কারণে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের সদস্যদের ঈমানের জ্যোতি এত উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়েছে যে, সেখানে আঁধারের আর লেশমাত্র অবশিষ্ট নেই। সমস্ত গোঁড়ামী, অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার মুক্ত এই জামাতের সদস্যরা শুধুমাত্র মহান আল্লাহ্‌কেই বিশ্বাস করে, ভয় পায়, কোন অপশক্তিকে বিশ্বাস করে না, ভয় পাওয়ারতো প্রশ্নই উঠে না। খিলাফতের ছত্রছায়ায় অবস্থান করার কারণে আহমদী মুসলমানদের, সমাজের বা দুনিয়ার কোন প্রতারকের দ্বারা প্রতারিত বা পথভ্রষ্ট হবার কোন সম্ভবনা নাই, আলহামদুলিল্লাহ্।

একবার পাড়ার দুই জন বড়ভাইকে নিয়ে আমাদের বাড়ির সামনে মসজিদ/স্কুলের মাঠে এক ধর্ম সভার আয়োজন করি (অ-আহমদী অবস্থায়)। সভায় ওয়াজ করার জন্য একজন ভাল বক্তার খোঁজ পেয়ে তার কাছে যেয়ে আমন্ত্রণ জানাই। মৌলভী সাহেব একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ তোহফা হিসাবে দাবী করেন। সভায় উপস্থিত সাদুল্লাপুর হাইস্কুলের প্রধান মৌলভী সাহেবকে প্রশ্ন করি একটা নির্দিষ্ট অঙ্কের টাকা নির্ধারণ পূর্বক তার বিনিময়ে ওয়াজ করা জায়েজ কিনা ? তিনি বললেন জায়েজ নয় তবে মৌলভী সাহেবরা কি মানুষের ঘরে সিঁদ কেটে সংসার চালাবে ? সিঁদ হয়ত কাটে না তবে ধর্ম ব্যাবসায়ী এই মৌলভীরা ধর্মের নামে লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জন করে অত্যন্ত বিলাস বহুল জীবন যাপন করে। এরা সমাজে ঐক্যের পরিবর্তে বিভেদ সৃষ্টি করে, শান্তির পরিবর্তে অশান্তি ছড়ায়। মানুষকে যুক্তি প্রমাণের মাধ্যমে প্রেম ভালবাসা দিয়ে মুসলমান বানানোর পরিবর্তে গায়ের জোরে মুসলমানকে কাফের ফতোয়া দিয়ে দূরে ঠেলে দেয়। যুগ ইমামকে না মানার কারণে অজ্ঞানতার অন্ধকারে নিমজ্জিত ধর্মের ধ্বজাধারী এসব ধর্মান্ধ দেশ ও

জাতিকে চরম বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দেয়। প্রতি যুগেই আমরা এর প্রমাণ পাই। ইংরেজ আমলে শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান ও ইংরেজী চর্চার বিরুদ্ধে ফতোয়া দিয়ে এরা মুসলমান জাতিকে কত যুগ পিছিয়ে দিয়েছে তা কে না জানে। এই তো সে দিন (১১/০১/২০১৯-প্রথম আলো) হেফাজতে ইসলামের আমীর আল্লামা শাহ্ আহমদ শফী শুক্রবার জুমুআর নামাজের পর চট্টগ্রামের হাটহাজারীর দারুল উলুম মইনুল ইসলাম মাদ্রাসার বার্ষিক মাহফিলে মেয়েদেরকে স্কুল কলেজে পাঠাতে না করলেন। পাঠালেও মেয়েরা যেন চতুর্থ/পঞ্চম শ্রেণির বেশি না পড়ে সে বিষয়ে সতর্ক করলেন। অথচ আমাদের প্রিয় নবী (সা.) সুস্পষ্ট ভাবে ঘোষণা করেছেন **"বিদ্যা অর্জন করা প্রতিটি মুসলমান নর ও নারীর জন্য অবশ্য কর্তব্য"** (ইবনে মাজা)। এমনকি তিনি (সা.) আরো বলেছেন **"বিদ্যা অর্জন করার জন্য যদি চীনে যেতে হয় তাও যাও।"** এখানে তো কোন ভেদ করা হয়নি। নারী পুরুষ নির্বিশেষে সবার জন্য জ্ঞান আহরন করা আবশ্যক বলে নির্ধারণ করা হয়েছে এবং তা সুদূর কোন অঞ্চলে গিয়ে হলেও। যথাযথ ভাবে পর্দা পালন করে মেয়েরা উচ্চ শিক্ষা অর্জন করতে পারে। কোথাও তো তিনি (সা.) এ কথা বলেন নি যে মেয়েদেরকে কম লেখাপড়া শিখাও, পুরুষদেরকে বেশী। বরং কখনো নারী, পুরুষের চেয়ে বেশী সাফল্য অর্জন করেছে। উদাহরণস্বরূপ– তিনি (সা.) হযরত আয়েশা (রা.)-কে ধর্মের অর্ধাংশের বেশী শিক্ষয়িত্রী হিসাবে উল্লেখ করেছেন। বর্তমানে বাংলাদেশে চিকিৎসা পেশায় নারীরা পুরুষের চেয়ে অনেক এগিয়ে রয়েছে (প্রথম আলো, ১৮/০১/২০১৯)। নারীরা যদি চিকিৎসা পেশায় এগিয়ে না আসত তাহলে জনসংখ্যার অর্ধেক নারীর চিকিৎসা যেমন– প্রসূতিরোগ, স্তন ক্যান্সারের অস্ত্রোপচার বা নারীর শরীরের স্পর্শকাতর অংশের অস্ত্রোপচার পুরুষ চিকিৎসককে দিয়ে করানো কতটা জটিল হত তা শফী সাহেবরা ভেবে দেখেছেন কি? এভাবে আরো অনেক ক্ষেত্র রয়েছে যেখানে নারীর ভূমিকা অনস্বীকার্য। নারীকে অশিক্ষিত রেখে অন্ধকারে রেখে কি কোন জাতি, কোন দেশ উন্নতি করতে পারে? ধর্মান্ধ মৌলভীরা যেমন ইসলামের উন্নতি চায় না তেমনি দেশের ও উন্নতি চায় না। এরা শুধু সমাজে ফিতনা ছড়ায়, দেশে ফাসাদ ছড়ায়। তাইতো আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) কত সুন্দরভাবেই না ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, **"মানুষের উপর এমন এক সময় আসবে, যখন ইসলামের মাত্র নাম এবং কুরআনের মাত্র অক্ষরগুলি অবশিষ্ট থাকবে। তাদের মসজিদ গুলি বাহ্যিক আড়ম্বরপূর্ণ হবে, কিন্তু হেদায়াতশূন্য থাকবে। তাদের আলেমগণ আকাশের নিম্নস্থ সকল সৃষ্ট জীবের মধ্যে নিকৃষ্টতম জীব হবে। তাদের মধ্য হতে ফেৎনা- ফাসাদ উঠবে এবং তাদের মধ্যেই তা ফিরে যাবে"**। *(বায়হাকী, মিশকাত)*

জামাতে ইসলাম, হেফাজতে ইসলাম, তালেবান, আইএস, বোকো হারাম, আল-শারাব, আল-ইসলাম দেশে দেশে ইসলামী নাম ও পোষাকের আড়ালে সংগঠন/জামাত কায়েম করে পবিত্র ইসলামের বারোটা বাজানোর অপতৎপরতায় লিপ্ত রয়েছে। এই সমস্ত ইসলামী নাম ও লেবাসধারী উগ্র ধর্মানন্ধদের অজস্র ঘৃণ্য সন্ত্রাসী কার্যকলাপের একটি নমুনা পেশ করছি:-

পঞ্চগড়ের আহমদনগরে নিজস্ব স্থাপনায় ২২-২৪শে ফেব্রুয়ারি আহমদীয়া মুসলিম জামাতের ৯৫তম সালানা জলসা [যেখানে মহান আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (সা.)-এর মহিমা কির্তন হত এবং পবিত্র ইসলাম ধর্মের অপার সৌন্দর্য বর্ণনা করা হত] প্রতিহত করার নামে গত ১৩/০২/২০১৯ তারিখে আহমদনগর জামে মসজিদ ও তার আশেপাশে অবস্থিত ১৫/১৬ টি বাড়িঘর ও ৪টি দোকানে ব্যাপক হামলা, ভাংচুর, লুটতারাজ ও অগ্নিসংযোগ করা হয়। এরই একটি বাড়িতে অবস্থান করছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ আহমদনগর হাইস্কুলের সাবেক প্রধান শিক্ষক অশীতিপর বৃদ্ধ, অসুস্থ, চলতে ফিরতে অক্ষম জনাব আবুল হাসান মাষ্টার সাহেব এলাকায় যার বহু ছাত্র রয়েছে। তাঁর বাড়িও হামলা ভাংচুর লুটতারাজ এবং অগ্নিসংযোগ থেকে রক্ষা পায়নি। তিনি তাঁর অসুস্থ স্ত্রী ও পূত্রবধুকে নিয়ে পালিয়ে প্রাণ বাঁচিয়েছেন। তাঁর কলেজ শিক্ষিকা কন্যা স্বপ্না শিশু সন্তানদেরকে নিয়ে একটি ঘরে আবদ্ধ থেকে কোন রকমে জান রক্ষা করেছে কিন্তু তার অপর ৩টি ঘর আসবাবপত্র সহ আগুনে ভস্মিভূত হয়েছে। এই কি খিদমতে ইসলামের নমুনা? প্রিয়নবী (সা.) ও তাঁর অনুসারীরা কলেমা পাঠকারীর বাড়িঘরে হামলা (নাউযুবিল্লাহ মিন যালিক) তো দূরের কথা ইসলামের কঠোর কোন দূষমনের বাড়িঘরেও হামলা ও অগ্নিসংযোগ করেন নি।

এদের ফেতনা, ফাসাদ ও সন্ত্রাসী কার্যকলাপে অতিষ্ট হয়ে বিশ্বের কিছু অজ্ঞ মানুষ পবিত্র ইসলাম ধর্মকেই দোষারপ করার অপচেষ্টা করছে। কিন্তু প্রকৃত সত্য হল, এদের এসব কাজের সাথে আল্লাহ্‌র মনোনীত ধর্ম ইসলামের ও ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা মহানবী (সা.)-এর দূরতম কোন সম্পর্ক নাই।

পক্ষান্তরে হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর মান্যকারী আহমদীয়া মুসলিম জামাতের মোবাল্লেগ/মুরুব্বী/মৌলানা সাহেবানরা দিবারাত্রি দুনিয়ার দুইশত বারটি দেশে ইসলামের বাণী প্রচারে ব্যাস্ত রয়েছে। তাঁরা ইহুদী, খৃষ্টান, হিন্দু, বৌদ্ধ ও অন্য ধর্মাবলম্বীদের কাছে নিরন্তর ইসলামের

শ্রেষ্ঠত্ব, ইসলামের সৌন্দর্য্য, ইসলামের মহানুভবতা, ইসলামের পারস্পারিক শ্রদ্ধাবোধ ও পরমত সহিষ্ণুতা, ইসলামের বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ ও ভালোবাসা অত্যন্ত বলিষ্ঠ কণ্ঠে যুক্তি ও দলীলের সাহায্যে উপস্থাপন করছে। এদের নিঃস্বার্থ সেবা ও ইসলাম প্রচারে মুগ্ধ হয়ে প্রতি নিয়ত পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে দলে দলে অন্য ধর্মালম্বীরা ইসলামের শান্তির পতাকাতলে সমবেত হচ্ছে। ইসলামের প্রাথমিক যুগের মোবাল্লেগদের (ইসলাম ধর্ম প্রচারক) মত আহমদীয়া মুসলিম জামাতের মৌলানা সাহেবানরা অত্যান্ত সহজ সরল ও অনাড়ম্বর এবং অনেক সময় কষ্টকর জীবন যাপন করেন ইসলামের সেবা করছেন। আল্লাহ্‌র মনোনীত ধর্ম ইসলাম ও মহানবী (স.)-এর সুমহান আদর্শ প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্য এহেন দুঃখ নাই যা তাদেরকে সইতে হয় না, এহেন কষ্ট নাই যা তাদেরকে করতে হয় না। মহান আল্লাহ্‌র জন্য তাঁদের ত্যাগ তিতিক্ষার এই ইতিহাস অনেক লম্বা। কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে আমি সংক্ষেপে একটি ঘটনার উল্লেখ করছি:

আহমদীয়াতের ইতিহাসে মৌলানা করম ইলাহী জাফর একজন বিখ্যাত বুজুর্গ ব্যাক্তীত্ব ছিলেন। আহমদীয়া মুসলিম জামাতের দ্বিতীয় খলীফা হযরত মির্যা বশির উদ্দিন মাহমুদ আহমদ আল মুসলেহ মাওউদ (রা.) ১৯৫৬ সালের দিকে তাঁকে আহমদীয়াত তথা প্রকৃত ইসলাম প্রচারের জন্য স্পেন প্রেরণ করেন। তখনকার দিনে তাঁর এই যাত্রা সহজ ছিল না এবং সেখানে তাঁকে বাইরে থেকে কোন অর্থ প্রেরণ করা সম্ভব হতো না। মৌলানা করম ইলাহী জাফর সাহেব ঠেলাগাড়িতে করে আতর/সুগন্ধির ব্যবসার মাধ্যমে অর্জিত অর্থ দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করতেন আর বাকী অর্থ দিয়ে স্পেনিশ ভাষায় বই পুস্তক ছাপিয়ে বিনা মূল্যে খৃষ্টান ও অন্যদের মধ্যে বিতরণ করতেন। তাঁর তবলীগ করার পদ্ধতি ছিল এমন তাঁর ঠেলা গাড়ির একপাশে থাকত বইপুস্তক অন্যপাশে আতর/সুগন্ধির শিশি, সরঞ্জাম ইত্যাদি। তিনি ঠেলা গাড়ী ঠেলে ঠেলে এক স্থানে যেয়ে থামতেন। লোক জন জড়ো হয়ে তাঁকে ঘিরে ধরত। তিনি প্রথমে আতর/সুগন্ধী স্প্রে করতেন। সৌরভ/সুবাস চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ত। তিনি বলতেন এই সুগন্ধ কিছুক্ষণ পরে বাতাসে মিলিয়ে যাবে। কিন্তু আমার কাছে আরো এক প্রকার সুগন্ধ/সৌরভ আছে যা কখনো শেষ হবে না, বাতাসেও মিলিয়ে যাবে না। সারা জীবন এবং মৃত্যু পরবর্তী জীবনেও তা তোমাদেরকে সুবাসিত রাখবে। এই বলে তিনি তখন ইসলামী বইপুস্তক তাদের মাঝে বিতরণ করতেন। কখনো সাড়া পেতেন। কখনো প্রচণ্ড বিরোধিতা হত। ঠেলা গাড়ি ভেঙ্গে দিয়ে তাঁকে প্রহারে প্রহারে জর্জরিত করা হত। কখনো পুলিশ দিয়ে ধরিয়ে দিয়ে কারাগারে নিক্ষেপ করা হত। খোদার খাতিরে অম্লান বদনে তিনি সব সহ্য করে তবলীগ অব্যাহত রাখেন। তাঁর এই কুরবানীর ফলে ধীরে ধীরে মানুষের অন্তরগুলি আলোকিত হতে শুরু করে। স্পেনে একটা জামাত কায়েম হয়। হযরত হাফেজ মির্যা নাসের আহমদ খলিফাতুল মসীহ সালেস (রাহে.) ৯ অক্টোবর ১৯৮০ সালে স্পেনের পেড্রোয়াবাদ নামক স্থানে মসজিদে বাশারতের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন এবং **"ভালোবাসা সবার তরে ঘৃনা নয়কো কারো 'পরে"** তাঁর এই অমর বাণী ঘোষণা করেন যা একান্তই ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা। তাঁর (রাহে.) প্রেম ভালোবাসা পূর্ণ বাণীতে মুগ্ধ হয়ে স্পেনের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ব্যাপকভাবে এই প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিল যে, ইতিপূর্বে এদেশে তরবারীর মাধ্যমে ইসলামের আবির্ভাব হয়েছিল, আমরা তরবারী দ্বারাই তাদেরকে এদেশ থেকে বিতাড়িত করেছি (তাদের একথা মিথ্যা, অতীতেও ঈমান আমলের মাধ্যমে ইসলামের বিজয় অর্জিত হয়েছিল)। কিন্তু এখন তারা যে ভালোবাসার শক্তি দিয়ে স্পেনবাসীর অন্তরকে জয় করে নিচ্ছে, তাকে মোকাবিলা করার মত সক্ষমতা কি স্পেনবাসীর আছে?

আহমদীয়া মুসলিম জামাতের চতুর্থ খলীফা হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.) ১০ সেপ্টেম্বর ১৯৮২ সালে ঐতিহাসিক সেই **'মসজিদ বাশারত'** উদ্বোধন করেন। এভাবে দীর্ঘ ৭০০ বছর পরে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের মাধ্যমে স্পেনে আবার ইসলামের জয়যাত্রা শুরু হয় যা এক দীর্ঘ সময় ধরে মুসলমান শাষনাধীনে ছিল।

সারা দুনিয়ায় আহমদীয়া মুসলিম জামাত পরিচালিত ইসলামের এই বিজয় অভিযান যা যুক্তি ও দলীলের মাধ্যমে, প্রেম ও ভালবাসার মাধ্যমে, দোয়া ও মহান আল্লাহ্‌র সাহায্যের মাধ্যমে, তা মোকাবিলা করার মত শক্তি পৃথিবীতে কারো নেই।

আমি অ-আহমদী ছিলাম। গোঁড়ামী, অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার, ধর্মের নামে অধার্মিকতা, শঠতা, বর্বরতা কিভাবে প্রতিটি মানুষকে, পরিবারকে, সমাজকে কূরে কূরে খাচ্ছে , তা প্রত্যক্ষ করেছি। শয়তানের ঐ বন্দীদশা থেকে, অন্ধকারের অতল গহবর থেকে, দূষিত, বিষাক্ত ঐ সমাজ থেকে মুক্তির জন্য পরম করুণাময় মহান আল্লাহ্‌র নিকট সকরুন মিনতি জানিয়েছি। মহান আল্লাহ্‌কে সাক্ষী রেখে বলছি, তিনি দোয়া শুনেছেন এবং অত্যন্ত দয়াপরবশ হয়ে আলো ঝলমল জান্নাতরূপী এই জামাতে প্রবেশের সুযোগ দিয়েছেন। এই লেখাটি যদি সম্মানিত কোন অ-আহমদী বন্ধু পড়েন তাহলে তাকে আহবান জানাব আসুন, অন্ধকার থেকে আলোর ভূবনে, ভালবাসার ভূবনে।

আমরা মানুষ

কৃষিবিদ মোহাম্মদ ফজল-ই-ইলাহী

আজকাল মানুষ কেবল এ ধারণা করে যে, যেহেতু আমরা মানুষ এবং সৃষ্টির সেরা, খোদার প্রিয় সৃষ্টি সুতরাং আমরা আমাদের সুখের নিমিত্তে যেমনটি খুশি, যা ইচ্ছে খুশি তা-ই করব। সম্পদ গড়ব, সৌধ বানাব, ক্ষমতার দাম্ভিকতা দেখাব। সুযোগে অবিচার, ব্যভিচার ইত্যাদি করব। ক্যাসিনো কারবারে অবৈধ উপার্জনে ধনাঢ্য হবো। যাকে খুশি মারব, যার জমি খুশি দখল করব। আরো কত কিছু। কেননা আমরা মানুষ। আমরা অসাধারণ ক্ষমতার অধিকারী মানুষ। যারা আমাদের চেয়ে দুর্বল, নগন্য তাদের ওপর আমাদের ক্ষমতার দাপট খাটাব। আমাদের বিবেকের দুষ্ট কৌশলে আমরা এমনটিই করব। আমরা ক্ষমতাবানেরা ধনে বড় হবো, মানে সেরা হবো। বিজ্ঞ হবো। একদিকে গড়ব, অন্যদিকে ধ্বংস করব। কাজ আমাদের এমনটিই। এই উদ্দেশ্যেই আমরা পরস্পর প্রতিযোগিতা করব। জীবনের অবশেষে নামায পড়ব, হজ্জব্রত পালন করব। সদকায়ে যারিয়া হিসাবে মসজিদ মন্দির নির্মাণ করে যাব। মানুষের জল সমস্যার সমাধান কল্পে লম্বা একখানা দিঘী করে দিব। অতঃপর মৃত্যুবরণ করব। আমাদেরকে গার্ড অব অনারে সমাধিস্থ করা হবে। মৃত্যু বার্ষিকীতে আমাদের কবর সৌধে ভক্তগণ অথবা আমাদের হতে অনুদান প্রাপ্তগণ ফুল দিয়ে আমাদের কবরগুলিতে সুগন্ধ ছড়াবে অত:পর আমাদের ভক্তগণ ভক্তিতে দোয়া করবে এতেই আমাদের মানুষ জন্মের সার্থকতা। এজন্যই আমরা মানুষ। আমরা আমাদের দায়িত্ব যথাযথ পালন করেছি। সুতরাং আমাদের আত্মা শান্তিপ্রাপ্ত। খোদা আমাদের ওপর সন্তুষ্ট।

হে অর্বাচীনগণ! মোটেই তেমনটি নয়। যেমনটি তোমরা ভাবছ। এরজন্যই আমরা মানুষ নহি। এরই নাম মানবতা নয়। মানুষ মানুষের জন্য। স্রষ্টার সকল সৃষ্টির জন্য। পরস্পর পরস্পরের জন্য। কেননা মানুষ সৃষ্টির সেরা, জ্ঞানে সমৃদ্ধ সুতরাং তার সমাদর হবে সবচেয়ে সেরা। অতএব ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সকল প্রাণি ও সকল বস্তুর প্রতি রয়েছে মানুষের সবিশেষ দায়িত্ব। এই দায়িত্ব সম্পাদনের উদাসীনতায় ও ব্যর্থতায় মানুষ, মানুষ নহে, অমানুষ। সৃষ্টির উত্তম নহে, অধম। পৃথিবী এমন কোন মানুষ নেই যার কাছে কিনা খোদার সৃষ্ট-প্রাণি-বস্তুর কোন না কোন অধিকার নেই। এই অধিকার বহুবিধ, বহু ধারার। বিশাল এই সৃষ্টি তার সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের নিমিত্তে মানুষের কাছে দয়ার্দ্র অনুকম্পা আশা করে। মানুষের বিবেক অন্যান্য সব সৃষ্টির চাহিত নিরাপত্তা দান করবে এটাই অন্য সব ইতর সৃষ্টির মানুষের কাছে প্রত্যাশা। যদিবা এই আশা কোনভাবে খর্ব হয় তবে মানুষ তার জন্য কঠিনভাবে দায়ী থাকবে। এমন নিষ্ঠুর স্বভাবের মানুষের নাম অমানুষের তালিকায় লিপিবদ্ধ থাকবে। বিশেষ করে মানুষের কাছে মানুষের বাৎসল্য প্রাপ্তির এ আবেদন অত্যন্ত আবেগের ও অত্যন্ত বড় আকারের। প্রত্যেকটি মানুষের বিবেক-বুদ্ধি, চিন্তা-চেতনা, বচন-আচরণ, শ্রবণ- দেখন, বিচার-শাসন ইত্যাদি প্রত্যেকটি বিষয় হতে প্রতিটি মানুষ ও প্রতিটি প্রাণি কামনা করে। খোদা এরই নাম দিয়েছেন 'হুকুকুল ইবাদ' সৃষ্টির অধিকার। এই অধিকার আদায়ে কোনভাবেই ব্যর্থ হওয়া যাবে না। কোনভাবেই লঙ্ঘন করা যাবে না। এতদ্ব্যতীত মানুষের অন্যসব কর্মই অসার, অমূলক।

সুতরাং হে মানুষ! স্মরণ রেখো, খোদার বিধানের বাঁধন থেকে মুক্ত হয়ে লম্পঝম্প দিয়ে চলার কোন অবকাশ নেই। কেবলমাত্র মানুষই খোদার সকল বিধান ও বাধ্যবাধকতা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে মেনে চলতে বাধ্য, এটা মানুষের জন্য খোদার নির্দেশ। অন্য আর সব সৃষ্টির বেলা তা প্রযোজ্য নহে। কেননা মানুষকে বিবেক দেয়া হয়েছে। তারা বিবেকের অধিকারী। 'বিবেক' খোদার পক্ষে এক বিশেষ দান। এর অপব্যবহার কঠিনভাবে নিষিদ্ধ। সৃষ্টির মধ্যে কেবল মানুষকেই হাশরাসরে এই মহাসম্মানীত সম্পদের জাড়রা-জাড়রা হিসাব দিতে হবে। সুতরাং বিবেককে ঐশী বিধানের বাইরে ব্যবহার করা সম্পূর্ণভাবে অবৈধ। যেহেতু মানুষ ব্যতীত অন্য সব সৃষ্টি বিবেক প্রাপ্ত নয় তাই এদের জীবনের হিসাব প্রদানেরও কোন প্রশ্ন নেই। এমন বিষয়টির কারণেই মানুষকে উপলক্ষ্য করে আমার লেখার উদ্দেশ্য। মানুষকে তার বিবেকের সুশীল ব্যবহার এই ঐহিক জীবনেই নিশ্চিত করে যেতে হবে। নতুবা পরকালে এ জীবন স্বর্গীয় ব্যবস্থাপনা কর্তৃক সসম্মানে গৃহীত হবে না। পরন্তু ঘৃণীত দ্রব্যের ন্যায় প্রত্যাখ্যাত হবে বৈ কী? সুতরাং মানুষের জন্য ইহলৌকিক জীবনটা অতীব চিন্তাবিভোর এক অধ্যায়। একাধারে মানুষ মানুষকে দিতে হবে তার প্রাপ্য অধিকার যার নাম 'হুকুকুল এবাদ' অন্য দিকে আদায় করতে হবে খোদার প্রাপ্য অধিকার 'হুকুকুল্লাহ'। মানুষ ও ইনসান খোদা সন্নিকট ওয়াদা করে আসছে যে, তারা কেবলই খোদার ইবাদত করবে। এ ইবাদত শুধু আরাধনা তথা ধর্ম চর্চার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। ইনসানের প্রতিটি কর্ম ধর্ম

চিন্তা চেতনা মেধা বিনিয়োগ শাসন বিচার হুকুম নিষেধ লালন পালন ইত্যাদি সর্বত্র সফল পদক্ষেপে তার ইন্দ্রীয় বিনিয়োগ হতে হবে। সুমহান গুণের, পরিপূর্ণ পরিমাপের ও পরিশুদ্ধ এবং খ্যাত। হযরত রাসূল পাক (সা.) বলেছেন, "যখন তোমার কর্তৃক সাধিত কোন সৎ কাজ তোমাকে প্রফল্লতা দিবে এবং অসুন্দর অসৎকাজ তোমাকে পীড়া দিবে তখন তুমি বিশুদ্ধ মু'মিন। আর অসৎকাজ হলো, যখন কোন কাজ করতে তোমার অন্তরে বাধে এটাকেই মনে করবে অসৎকাজ" (পুস্তক কুরআন ও জীবন পৃ. ২২৬, ৩৩৬ নং হাদীস) অতএব মানুষ স্বয়ং নিজেই পরিমাপ করতে সক্ষম যে, কোন্‌টি তার নেকী আর কোনটি তার পাপকর্ম। যদি মানুষ যথার্থভাবে এ পরিমাপে ব্যর্থ হয় তবে অসম্ভবভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে তার মানুষ হয়ে জন্মলাভের সার্থকতা।

কিন্তু অতীব পরিতাপের বিষয় এই যে, আমি কাকে বলব এমনি ধরণের আদর্শবাদী কথা? কে শুনবে আমার অখ্যাত কলমের এই আবেদন? মানুষ মানুষকে জীবিকা করে যেভাবে স্বার্থ চরিতার্থ করছে তাতে আদৌ মনে হয় না যে, খোদা কর্তৃক মানুষকে দেয়া সুমহান দান বিবেকের সৎব্যবহার হচ্ছে। মানুষকে সর্বদাই এ সত্য স্মরণ রাখতে হবে যে, মানুষের প্রবৃত্তি কখনো পশু স্বভাব সদৃশ ব্যবহার হতে পারে না, তাহলে মানুষ ও পশুতে পার্থক্য কোথায়? পশু কেবল একই দৃষ্টিকোণ থেকে ক্রোধ ও উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে কাজ করে। পক্ষান্তরে মানুষের বিবেক যেখানে ক্রোধান্বিত না হওয়া বলে সায় দেয়, সেখানে সে তা-ই করবে। আর যেখানে ক্রোধান্বিত হওয়া বলে সমীচীন মনে করে সেখানেও সে তা-ই করবে। তবেই মানুষ বিবেক সম্পন্ন মানুষ। এখানেই মানুষ হয়ে জন্ম লাভের সার্থকতা। কিন্তু আজকাল মানুষের চরিত্র বিবর্জিত কুকর্ম লক্ষ্য করলে দুঃখ হয়, মানুষ তাহলে মানুষ কেন? এরই নাম বিবেক? এটাই মানুষকে দেয়া খোদার উৎকৃষ্ট দান?

বিবেককে বলা হয়েছে, তুমি সুন্দর দেখবে, হালাল খাবে, মঙ্গল করবে, সৎপথে চলবে, অন্যের এহসান করবে, দুঃখীর দুঃখ মোচন করবে, সত্যের পক্ষের কণ্ঠ হবে। নিরীহের সহায় হবে, লোভকে সংবরণ করবে, নারীর ভোষণ হবে, অন্যায়ের বিপক্ষে লড়বে, খোদার পক্ষের আহ্বানকারীর সাহায্যকারী হবে। কিন্তু কৈ, মানুষের কর্মকাণ্ড তো এর কিছুতেই নেই। আছে কেবল ঐহিক এশ্বর্য লাভের ঐকান্তিক চেষ্টা। নিজেকে বড় ও খ্যাতিমান করার নিরলস প্রবৃত্তি। এ পর্যায়ে মহান আল্লাহ্ বলেন, "আত্মার কসম এবং (কসম) ইহার যে, তিনি ইহাকে পূর্ণাঙ্গ করিয়াছেন। অতঃপর তিনি ইহাকে বলিয়া দিয়াছেন– ইহার মন্দ পথ এবং ইহার তাকওয়ার পথ। সুতরাং যে ইহাকে পবিত্র করিয়াছে সে অবশ্য অবশ্যই সফলকাম হইয়াছে এবং যে ইহাকে (মাটিতে) প্রোথিত করিয়াছে সে অকৃতকার্য হইয়াছে" (আল কুরআন: ৯১ঃ-৮-১১)। মানুষের কৃতকর্মের চেহারা দেখলে প্রতীয়মান হয় যে, মানুষের আত্মা এখন আম্মারার (অবাধ্য আত্মা) স্তরে। কুকুর, শুকুর আর বাঘ হায়ানার স্বভাব সদৃশ। কিন্তু মানুষ স্বর্গালয় হতে সনদ নিয়ে আসছে "আশরাফুল মাখলুকাত" সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ বলে। মূলত সেসব কর্মের কথা শুনলে অথবা দেখলে সাধু স্বভাবের আত্মা সভয়ে শিহরে উঠে। মানুষের এহেন বর্বরতা দেখে নিরীহগণ এখন পশুর বিচরণ স্থল জঙ্গলে গিয়ে থাকতে নিরাপদ বোধ করে। কথা ছিল–

"প্রত্যেকের তরে প্রত্যেকে আমরা
প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।"

"তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তিই উত্তম যেকিনা নিজের জন্য যা পছন্দ করে সে অন্যের জন্যও তা-ই পছন্দ করে।" (আল হাদীস) এখন কথা হচ্ছে, আমি আমারই জন্য, প্রত্যেকের জন্য নহি। আমার পছন্দকে আহরণ করতে আমি আমার বাহুবলে যা ইচ্ছা এবং যা খুশি তা-ই করব। অন্যের পছন্দকে মূল্যদান আমার দায়িত্ব নহে। বর্তমানে এই নীতিই সব দেশের প্রায় সবার মধ্যে বিদ্যমান। ফলে নিকৃষ্টতম মিথ্যা, দুর্নীতি, হঠকারিতা, পরস্বহরণ, পর- অহীত সাধন পরস্পরের মধ্যে অপ্রতিরুদ্ধ ধারায় চলছে। কিন্তু সত্য ইহাই যে, মানুষ কর্তৃক সাধিত অপকর্মের এমন ভয়ঙ্করতা ঐশী জগত কর্তৃক স্বীকৃত হতে পারে না। কেননা এর ফলে খোদার সৌন্দর্য, সর্বময় ক্ষমতা ও শান্তির আধার গুণের অক্ষমতা সাব্যস্ত হয় (সুবহান আল্লাহ্) এই বর্বর স্বভাবের মানুষগুলিকে সুমহান মানুষ বানানোর নিমিত্তে আগত এলাহী জগতের প্রতিনিধি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, "মানুষের বীরত্ব কুকুর ও হিংস্র জন্তুর ন্যায় নহে, যাহা শুধু স্বভাবজাত উত্তেজনার ওপর নির্ভর করে এবং এক দিকে চলে। বরং মানুষের বীরত্বের দ্বারা নিজ প্রবৃত্তি ও উত্তেজনার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে এবং উহাকে দমন করে। আবার কখনো যখন দেখে যে, শত্রুর সহিত সংগ্রাম করাই সমীচীন, তখন শুধু প্রবৃত্তির তাড়নায়ই নহে, বরং সত্যের সাহায্যের নিমিত্তে শত্রুর সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু নিজ ব্যক্তিত্বের ভরসায় নহে, বরং খোদার ওপর ভরসা করিয়া বীরত্ব প্রদর্শন করে এবং তাহাদের বীরত্বে কোন কপটতা বা আত্মম্ভরিতা থাকে না এবং (তাহারা) অন্ধ প্রবৃত্তির অনুগমন করে না বরং সবদিক দিয়ে খোদার সন্তুষ্টিকেই প্রাধান্য দেয়" (পুস্তক, ইসলামী নীতিদর্শন, পৃ. ৬৪)। মানুষের অন্তর রাজ্যে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর এই অনুপম শিক্ষাই এখন বিস্তর আয়োজনে বাস্তবায়িত হওয়া দরকার। মানুষকে অবশ্যই এই নীতি আমলে নিতে হবে। তবেই মানুষের প্রবৃত্তির পশুত্বের বিষক্রিয়া দূরীভূত হবে। অন্যথায় বিশ্বজুড়ে বিরাজমান অশান্তির হুতাশন নির্বাপিত হবে না। বাস্তবতা এই যে, পৃথিবীর কোন দেশের কারোর কাছেই চরম এ অশান্তির হুতানল নির্বাপনের যন্ত্রমন্ত্র নেই। কারোর লিখনে বলনে জ্ঞান আচরণে আদেশে আদর্শে প্রশান্তি দেয়ার কোন শিক্ষণ নেই। সহানুভূতির সাথে সহোদর করার কোন সন্ধানী নেই। নেই কোন সদোপদেশ। তাই মানুষ মারছে, মানুষ মরছে। ফলে রূষ্ট হচ্ছে মানুষের ওপর খোদার মেজাজ। কাজেই বিভিন্ন

ধরণের অসাধারণ ও অকল্পনীয় আযাব-গজব আসছে দেশে দেশে ঘরে ঘরে। তদবধি তার থেকে নিস্তার লাভ হবে না যদবধি না আমরা খোদার সিদ্ধান্তের সাথে একমত হই। খোদার শর্তারোপিত সৎমানুষ হই। খোদার প্রত্যাদিষ্ট জনের ছত্রছায়ায় একত্র হই। হে মানুষ! কোন ভাবেই অসাধারণ ও ভয়ঙ্কররূপের ইত্যাকার ঐশী দুর্বিপাক যাকিনা আমাদেরকে নিত্য নতুন বিভিন্ন কায়দায় আচমকা আক্রমণ করছে তা থেকে নিস্তার লাভ সম্ভব নয় যদি না আমরা তাঁরই অনুকম্পা লাভের বাসনায় তাঁরই দ্বারস্থ হই। একদিকে খোদার বিরূপ মনের কঠিন আযাবের কঠিন বিপর্যয় অন্যদিকে মানুষ নামের অমানুষের কুপ্রবৃত্তির আক্রমণের প্রমত্ততা মানুষের আশা ও বাসনাকে সর্বৈব সর্বনাশ করছে। পরন্তু পথ নাই এই ভয়ঙ্করতা হতে পরিত্রাণ লাভের।

তাই বলছি, পৃথিবীতে আগত স্বর্গীয় শান্তির দূত ইমাম মাহ্‌দী ও মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর শুভাগমনের কথা। এটা আপনার আমার সবার জন্য অসাধারণ শুভ সংবাদ। যা আত্মার খাদ্য, চিন্তার খোরাক। আসুন আমরা আমাদের অন্তরে লালিত দ্বন্দ্ব দ্বৈততা পরিহার করতঃ খোদার অভিলাষ সুলভ মানুষ হওয়ার নিমিত্তে বিষয়টিকে নিয়ে বিনয়াবনত চিত্তে ভাবি। এটাই আমাদের এখন কাজের কাজ, প্রধান দায়িত্ব। এই দায়িত্বকে হেলা করা মোটেই সমীচীন নহে। কিন্তু দুঃখের সাথে লক্ষ্য করছি যে, মানুষ জাগতিক সম্পদ লাভ লোভে, স্বীয় স্বার্থ উদ্ধার ও ধনার্জনের কামনা বাসনায় স্বর্গীয় এই সত্যকে এখন এড়িয়ে চলছে। পৃথিবীকে আযাবখানা বানিয়ে বেহুশ বেচৈন মানুষ– খোদা বিমুখ পথে দৌড়াচ্ছে। কিন্তু কথা ছিল, জিন ও ইনসান কেবল তাঁরই চর্চা-ইবাদত করবে। তাঁর হয়ে তাঁরই স্মরণে কাঁদবে। কিন্ত হায়! বড়ই আক্ষেপ যে, এমনটি মানুষ বেমালুম ভুলে গিয়েছে। বরং যিনি খোদার প্রতিনিধিরূপে সনদ সাথে করে খোদার অভিব্যক্তি বাস্তবায়নের অভিপ্রায়ে ডাকছেন তাঁকে কিনা মানুষ মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করার জন্য প্রাণান্ত চেষ্টায় ষড়যন্ত্র করছে। কিন্তু সেই স্বর্গীয় মহাপুরুষ হেদায়াত প্রাপ্তদের নেতা জামানার ধর্ম সংস্কার (আ.) বলেছেন, "আমি খোদার স্বহস্তে রোপিত বৃক্ষ। আমার মধ্যে অকৃতকার্যের বীজ নেই। আমি অকৃতকার্য হতে আসি নি। পৃথিবীবাসীর সর্বাত্মক বিরোধিতা সত্ত্বেও আমি বিজয় লাভ করব। কেননা খোদার সাহায্যকারী ফেরেশ্‌তা আমার সাথে আছে। সুতরাং যারা আমার পবিত্র সাধনার অন্তরায় হয়ে সংগ্রাম করবে তারা নির্ঘাৎ ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। খোদা মহাপরাক্রমশালী আক্রমণসমূহের দ্বারা তিনি তাঁর প্রিয় প্রতিনিধিকে পৃথিবীতে বিজয় দান করবেন। আমার অনুগমনকারীদের পুণ্যামল বিনিময়ে পৃথিবীতে পুনঃ শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে। যথাসময়ে বৃক্ষে ফুল ফুটবে, বসন্ত আসবে। শীত গ্রীষ্ম ও বর্ষা, আসবে। অশান্ত পরিবেশ পুনরায় শান্তির বারি বর্ষিত হবে'।

হে বন্ধুগণ! খাকসারের বড় দুঃখ এই জন্য যে, যারা খোদা প্রদত্তজনের পবিত্র মুখের এমন বিনয়ী আহ্বানকে প্রতিহিংসায় উপেক্ষা করে পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করছে।

হে স্বর্গীয় এ সত্যের বিরুদ্ধবাদীগণ! স্মরণ রাখুন, এক্ষণে খোদা বলেছেন, 'এবং যদি না তোমার ওপর আল্লাহ্‌র ফযল এবং রহমত হইত তাহা হইলে তাহাদের মধ্য হইতে একদল দৃঢ় সংকল্প করিয়াছিল যেন তোমাকে ধ্বংস করে। কিন্তু তাহারা নিজদিগকে ব্যতীত অন্য কাহাকেও ধ্বংস করে না এবং তাহারা তোমার কোন অনিষ্ট করিতে পারে না.....। (মনে রেখো) তাহাদের অধিকাংশ পরামর্শের মধ্যে কোন কল্যাণ নাই– কেবল ঐ ব্যক্তির (পরামর্শ) ছাড়া যে দান-খয়রাত অথবা সৎকাজ অথবা লোকদের মধ্যে শান্তি স্থাপনের নির্দেশ দেয়। এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে উহা করে অচিরেই আমরা তাহাকে মহাপুরস্কার দান করিব। এবং যে কেহ তাহার নিকট হেদায়াত পূর্ণভাবে প্রকাশিত হওয়ার পরও এই রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া যাইবে এবং মু'মিনদের পথ ব্যতীত অন্য পথের অনুসরণ করিবে, আমরা তাহাকে সেই পথেই ফিরাইয়া দিব যে পথে সে ফিরিয়া গিয়াছে এবং আমরা তাহাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করিব; বস্তুত উহা বড়ই মন্দ অবস্থান" (৪:১১৪-১১৬)।

হে আমাদের প্রিয় খোদা! তুমি আমাদের সবাইকে তোমার তুমি আমাদের সবাইকে তোমার ঘোষিত সত্য গ্রহণ করার তৌফিক দান করতঃ পুণ্যাত্মার মানুষ কর এবং আমাদের সকলের প্রতি তুমি উদার চিত্তে অনুকম্পাশীল হও, আমীন।

সংবাদ

সংকলন: মোহাম্মদ ফজল-ই-ইলাহী

ঢাকা জামাতের মাদারটেক হালকায় সিরাতুন্নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত

গত ২৭ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখ রোজ শুক্রবার আহমদীয়া মুসলিম জামাত ঢাকার মাদারটেক হালকায় নবনির্মিত মসজিদুল হুদায় প্রথমবারের মতো সিরাতুন্নবী (সা.) জলসার আয়োজন করা হয়। উক্ত জলসার প্রধান অতিথি ছিলেন মোহতরম মাওলানা ফিরোজ আলম সাহেব, ইনচার্জ- বাংলাডেস্ক, লণ্ডন। তিনি মাদারটেক মসজিদে জুমআর নামায পড়ান। যথারীতি জুমুআর নামায আদায়ের পর কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে এই অনুষ্ঠান শুরু হয়। কোরআন তেলাওয়াত করেন হিফয ক্লাসের ছাত্র জনাব ইয়ামিন আহমদ। তিলাওয়াতকৃত অংশের অনুবাদ উপস্থাপন করেন জনাব শিহাবউদ্দীন মস্তান। অতঃপর একটি কোরাস নযম উপস্থাপন করা হয়। এটি উপস্থাপন করেন এস.এম. জারীউল্লাহ ও তার দল।

প্রথমেই উদ্বোধনী বক্তব্য প্রদান করেন মোহতরম ন্যাশনাল আমীর আলহাজ্ব মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী সাহেব। তাঁর বক্তৃতার বিষয়বস্তু ছিল **সকল ধর্ম ও ভিন্ন মতাবলম্বীদের সাথে সহাবস্থান– মহানবী (সা.)-এর আদর্শ।** মনোমুগ্ধকর এই বক্তৃতা উপস্থিত সকলে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনছিল। অতঃপর অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি মাওলানা ফিরোজ আলম সাহেব বক্তব্য প্রদান করেন। তাঁর বক্তৃতার বিষয়বস্তু ছিল **খাতামান্নাবীয়্যিন (সা.)-এর মহান জীবনাদর্শ।** অত্যন্ত আবেগ দিয়ে মাওলানা সাহেব তাঁর বক্তৃতা প্রদান করেন। উপস্থিত সকলে খুব আগ্রহভরে এটি শ্রবণ করেন। এরপর কিছুক্ষণ প্রশ্নোত্তর সভা চলে। মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেব কিছুক্ষণ অংশগ্রহণ করে মাওলানা রাসেল সরকার সাহেবের কাছে দায়িত্ব হস্তান্তর করে অনুষ্ঠান থেকে বিদায় নেন। অতঃপর মাদারটেক হালকার প্রেসিডেন্ট জনাব কুদরত-ই-রহমান ভূঁইয়া সাহেব মহানবী (সা.)-এর জীবনী থেকে কিছু মূল্যবান অংশ তুলে ধরেন। পরিশেষে শ্রদ্ধেয় সভাপতি আলহাজ্ব মীর মোহাম্মদ আলী সাহেব তাঁর মূল্যবান বক্তৃতা প্রদান এবং দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

উল্লেখ্য, উক্ত অনুষ্ঠানে ৫০ জনের অধিক জেরে তবলীগ ভাই সহ ৪০০'র অধিক সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

মাওলানা রাসেল সরকার
মুরব্বী সিলসিলাহ

কুষ্টিয়ার বাহাদুরপুর হালকায় সিরাতুন্নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত

আল্লাহ্ তা'লার অশেষ ফযলে গত ৭ জানুয়ারি ২০২০ রোজ মঙ্গলবার আহমদিয়া মুসলিম জামাত কুষ্টিয়ার বাহাদুরপুর হালকায় মহান সিরাতুন্নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত মহতি অনুষ্ঠানে সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ন্যাশনাল সেক্রেটারি তবলীগ জনাব মোহাম্মদ ইমতিয়াজ আলী, প্রধান অতিথি হিসেবে ছিলেন ন্যাশনাল সেক্রেটারি নও-মোবাঈন মাওলানা শাহ মোহাম্মদ নুরুল আমীন। এছাড়া সহকারী সেক্রেটারী নও মোবাঈন জনাব মিজানুর রহমান সাহেবও উপস্থিত ছিলেন। স্থানীয় মুরুব্বি সিলসিলাহগণ উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠানটিকে আরো প্রাণবন্ত করেন। মাগরিবের নামাযের পর কোরআন তেলাওয়াত-এর মাধ্যমে জলসা শুরু হয়। লোকাল কায়েদ জনাব রাব্বি রহমান কোরআন তেলাওয়াত করেন। তারপর নযম পেশ করেন জনাব নুরুল ইসলাম ফারুক। এরপর নবী করীম (সা.)-এর জীবনী নিয়ে আলোচনা পর্ব শুরু হয়। সবশেষে মাওলানা শাহ মোহাম্মদ নুরুল আমীন সাহেব বক্তব্য রাখেন। তারপর তবলীগী অধিবেশন আরম্ভ হয়। বিভিন্ন জায়গা থেকে প্রায় ১২০ জন জেরে তবলীগ ও মেহমান উপস্থিত ছিলেন এবং তারা নানান জ্ঞানগর্ভমূলক প্রশ্ন করেন যা রাত ১১ টা

পর্যন্ত চলতে থাকে। পরিশেষে দোয়ার মাধ্যমে উক্ত জলসার সমাপ্তি হয়।

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বটিয়াপাড়ার হলিধানী পকেটে ১২ জন নিষ্ঠাবান ব্যক্তির বয়আত গ্রহণ

গত ৬ ই জানুয়ারি ২০২০ মোহতরম ন্যাশনাল সেক্রেটারি নও-মোবাঈন জনাব মাওলানা শাহ মোহাম্মদ নুরুল আমীন সাহেবের নেতৃত্বে ০৮ জনের একটি প্রতিনিধি দল আহমদীয়া মুসলিম জামাত বটিয়াপাড়ার পকেট হলিধানী পকেট পরিদর্শন করে। সাথে সফরসঙ্গী হিসেবে স্থানীয় মুরুব্বিগণ ও স্থানীয় আহমদীদের পাশাপাশি ন্যাশনাল সেক্রেটারি তবলীগ জনাব ইমতিয়াজ আহমেদ সাহেবও ছিলেন। সেখানে এক আহমদী বাড়িতে তবলীগি প্রোগ্রাম ও আলোচনা অনুষ্ঠান সকাল ১১ টা থেকে শুরু হয়। প্রশ্নোত্তর অনুষ্ঠানে মহিলারাও বিভিন্ন প্রশ্ন করেন যার উত্তরও প্রদান করা হয়। যোহরের নামায আদায়ের পর খাওয়া দাওয়া শেষে আবারও আলোচনা চলতে থাকে। এভাবে রাত পর্যন্ত আলোচনা চলতে থাকে। আল্লাহ্‌র অশেষ রহমতে ১২ জন ভাইবোন বয়আত গ্রহণ করে আহমদীয়া জামাতে শামিল হন। তারপর সেখান থেকে রাত প্রায় ১০ টায় প্রতিনিধিদল ফিরে আসে।

শৈলমারি জামাতের জয়রামপুর পকেটে তবলিগী সেমিনারের আয়োজন

মোহতরম ন্যাশনাল সেক্রেটারি নও-মোবাঈন জনাব মাওলানা মোহাম্মদ নুরুল আমীন সাহেবের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল আহমদীয়া মুসলিম জামাত শৈলমারীতে নবনির্মিত মসজিদ পরিদর্শন করেন এবং সেখানে একটি তবলিগী সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন। সাথে সফরসঙ্গী হিসেবে স্থানীয় মুরুব্বিগণ ছিলেন। তারপর একটি পকেটে প্রতিনিধি দল সফর করেন আর পকেটটির নাম- জয়রামপুর। সেখানে তবলীগি প্রোগ্রাম হয় এবং ০১ জন বয়আত করেন। তারপর সেখান থেকে সন্তোষপুর জামাতে প্রতিনিধিদল সফর করে ও সাবেক প্রেসিডেন্ট মরহুম গফুর মাষ্টার সাহেবের কবর যিয়ারত করা হয়। অতঃপর সন্তোষপুর মসজিদে মাগরিব ও এশার নামায আদায় শেষে স্থানীয় আহমদীদের সাথে ঘরে ঘরে গিয়ে সৌজন্যমূলক সাক্ষাতও করা হয়।

মাওলানা শোয়েব আহমদ খন্দকার
মুরব্বী সিলসিলাহ

ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও সিলেট রিজিওনের ২য় আঞ্চলিক নও-মোবাঈন সম্মেলন অনুষ্ঠিত

গত ৮ নভেম্বর ২০১৯ শুক্রবার ঘাটুরা জামাতের মসজিদুল মাহ্‌দীতে মজলিস আনসারুল্লাহ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও সিলেট রিজিওনের উদ্যোগে ২য় আঞ্চলিক নও-মোবাঈন সম্মেলন অত্যন্ত সফলতার সাথে অনুষ্ঠিত হয়েছে,

দিনব্যাপী এ নও-মোবাঈন সম্মেলনের কার্যক্রম শুরু হয় সকাল ৯.৩০ মিনিটে। সভাপতিত্ব করেন মোহতরম আলহাজ্জ আহমদ তবশির চৌধুরী, সদর মজলিস আনসারুল্লাহ্‌। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব রফিকুল ইসলাম, নও-মোবাঈন (কসবা)। সভাপতি সাহেবের আহাদনামা পাঠ এবং ইজতেমায়ী দোয়ার পর নযম পাঠ করেন জনাব শয়ফুল আলম, নও-মোবাঈন (ইসলামগঞ্জ)। স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন জনাব মোশারফ হোসেন, রিজিওনাল নাযেমে আলা। অতঃপর উপস্থিত নও-মোবাঈনদের সাথে পরিচিতির পর সভাপতি সাহেব উদ্বোধনী বক্তব্য প্রদান করেন।

'নামাযের গুরুত্ব ও দোয়ার কবুলীয়ত' বিষয়ে বক্তব্য প্রদান করেন মাওলানা শেখ মোস্তাফিজুর রহমান (পলাশ) মুরব্বী সিলসিলাহ।

'আহমদীয়া মুসলিম জামাতের পরিচিতি এবং সাংগঠনিক অবকাঠামো' বিষয়ের একটি ভিডিও ক্লিপ প্রদর্শন করে ধারা বিবরণী বর্ণনা করেন মোহতরম সদর সাহেব।

বিকালে সমাপ্তি অধিবেশন হয়। প্রথমে বিভিন্ন মসলা-মাসায়েল এর ওপর ক্লাস পরিচালনা করেন মাওলানা শেখ মোস্তাফিজুর রহমান এবং মাওলানা জহির উদ্দিন আহমদ। নও-মোবাঈনের প্রশ্নোত্তর ও উন্মোক্ত আলোচনা করেন মোহতরম সদর সাহেব এবং মাওলানা সাহেবদ্বয় মোহতরম সদর সাহেবের সমাপ্তি ভাষণ, শুকরিয়া জ্ঞাপন এবং ইজতেমায়ী দোয়ার মাধ্যমে উক্ত নও-মোবাঈন সম্মেলনের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। সম্মেলনে আওতাধীন অঞ্চলের বিভিন্ন মজলিস ও এলাকা হতে ৪২ জন নও-মোবাঈন, ২১ জন জেরে তবলীগ ও মেহমান এবং দাঈ-ইল্লাল্লাহ্‌সহ মোট ৭৫ জন উপস্থিত ছিলেন।

মোশারফ হোসেন, রিজিওনাল নায়েমে আলা
মজলিস আনসারুল্লাহ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-সিলেট রিজিওন

বাইতুস সোবহান মসজিদে ১ম চুয়াডাঙ্গা জেলা নও মোবাইন সম্মেলন অনুষ্ঠিত

আজ আহমদিয়া মুসলিম জামাত উথুলীর বাইতুস সোবহান মসজিদে ১ম চুয়াডাঙ্গা জেলা নও মোবাইন সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ন্যাশনাল সেক্রেটারি নও মোবাইন জনাব মাওলানা নুরুল আমীন সাহেব। সারাদিন ব্যাপী এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রায় ৮৪ জন। এর মধ্যে নও মোবাইন ছিলেন ২৫ জন ও জেরে তবলীগ ১৫ জন। জুমুআর নামাজের পর তবলীগি প্রোগ্রাম ও প্রশ্নত্তোর অনুষ্ঠান হয়। খুবই সুন্দর প্রশ্নোত্তর পর্ব অনুষ্ঠান হয় ও ৩ জন বয়াত করেন। অবশেষে বিকেলে দোয়ার মাধ্যমে এই মহতী সম্মেলন এর সমাপ্তি ঘটে।

প্রেসিডেন্ট, চুয়াডাঙ্গা

বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া চট্টগ্রাম-সিলেট রিজিওনের উদ্যোগে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, চট্টগ্রাম-সিলেট রিজিওনের উদ্যোগে মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে ১৬ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখ মোতাবেক সোমবার ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নাসিরনগর উপজেলার নাসিরপুর গ্রামের নাসিরপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এক ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প বাস্তবায়ণ করা হয়। সকাল ৮.১৫ ঘটিকায় স্কুলের প্রধান শিক্ষক, সহকারী শিক্ষকগণ, শিক্ষার্থী, স্বেচ্ছাসেবকদের উপস্থিতিতে জাতীয় সঙ্গীত, প্যারেড এবং নিজ নিজ ধর্মীয়রীতিতে মোনাজাত বা প্রার্থনার মাধ্যমে প্রোগ্রামের উদ্বোধন করেন জনাব ডা. এখতিয়ার উদ্দিন শুভ-রিজিওনাল কায়েদ, চট্টগ্রাম-সিলেট। এদিনে এলোপ্যথিক চিকিৎসা, হোমিও চিকিৎসা, ব্লাড গ্রুপ পরীক্ষা, ডায়াবেটিস পরীক্ষা, রক্তচাপ পরীক্ষা ইত্যাদি সেবা প্রদান করেন। চিকিৎসক হিসাবে ছিলেন জনাব ডা. ইজাজুর রহমান শুভ (এলোপ্যাথিক) এবং ডা.এখতিয়ার উদ্দিন শুভ (হোমিওপ্যাথিক)। পরিসংখ্যাণ অনুযায়ী ২৩৫ জনকে এলোপ্যাথিক চিকিৎসা, ৭৭জনকে

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা, ২৩৬জনের ব্লাড গ্রুপ পরীক্ষা, ৪৪জনের ডায়াবেটিস পরীক্ষা করা হয়। ব্যবস্থাপত্র প্রদানের পাশপাশি প্রায় ২০ রকমের এলোপ্যাথিক এবং ৫০ রকমের হোমিও ঔষধ প্রদান করা হয়। প্রতিটি মানুষ সেবাগ্রহণের পর সন্তোষ প্রকাশ করেন, বিশেষ করে ছোট ছোট শিশুকিশোরদের ব্লাড গ্রুপিং এবং ডাক্তার দেখানোর আগ্রহ ছিলো প্রবল। ঔষধ পেয়ে সাধারণ মানুষজন প্রশংসা করেন। দুপুর ১.১৫মি. পর্যন্ত প্রথম পর্বে এবং ২.০০ হতে ৪.১৫ পর্যন্ত ২য় পর্বে নাসিরপুরে মেডিকেল ক্যাম্প চলমান ছিলো। একাজে সার্বিক সহযোগীতা করেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সিক্তা রানী রায়, অরুন জ্যোতি ভট্টাচার্য- ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি কাউসার আহমদ-সহ-সভাপতি, কমিটির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ, অমর ভট্টাচার্য সুমন, ঘাটুরা জামাতের প্রেসিডেন্ট জনাব এস এম ইব্রাহিম। নাসিরনগর এর স্থানীয় দুইজন সাংবাদিকসহ এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এতে উপস্থিত ছিলেন ও সহযোগীতা করেন। স্কুল কর্তৃপক্ষ, সকল শিক্ষক, কর্মচারীরা আন্তরিকতার সাথে আমাদের সাহায্য এবং আপ্যায়ন করেন। প্রোগ্রাম শেষে স্কুলের পক্ষে এর প্রধান শিক্ষককে ক্রেষ্ট এবং বিদ্যালয় সভাপতি, কর্তৃপক্ষ, শিক্ষকদের ডায়েরি এবং হুযূর (আই.)-এর "বিশ্ব সংকট ও শান্তির পথ" বই উপহার প্রদান করা হয়। এই মহতি কর্মসূচি বাস্তবায়ণে সার্বিক সহযোগিতা করেন ৫টি স্থানীয় মজলিসের (ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কোড্ডা, চট্টগ্রাম, শালগাও, ঘাটুরা, নাসিরনগর) ২৬জন খাদেম এবং স্থানীয় মওলানা সাহেবান।

বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা পেয়ে অত্র এলাকার মানুষ সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন এবং আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের এ সংগঠনের কার্যক্রমকে সাধুবাদ জানান। আহমদিয়া মুসলিম জামাতের খোদ্দামুল আহমদীয়া সংগঠন দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আর্তমানবতার সেবায় বিভিন্ন সেবামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। উক্ত সংবাদ বেশ কয়েকটি অনলাইন পোর্টালে ছবি সহ প্রকাশ হয়।

মাহমুদ আহমদ সুমন, মোহতামীম ইশায়াত
ম.খো.আ. বাংলাদেশ

বর্ণাঢ্য আয়োজনে বিজয় দিবস উদ্‌যাপিত

মহান বিজয় দিবস ২০১৯ উপলক্ষে মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া রাজশাহী রিজিওনের উদ্যোগে ১৬ ও ১৭ ডিসেম্বর ২ দিন ব্যাপী আনন্দঘন পরিবেশে নাটোর জেলার তেবাড়িয়াতে ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। বিভিন্ন খেলায় সংগঠনের সদস্যগণ অংশ নেয়। ১৬ তারিখে কুরআন তেলাওয়াত, জাতীয় পতাকা উত্তোলন এবং জাতীয় সংগীত পরিবেশনার মাধ্যমে ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া রাজশাহী রিজিওনের রিজিওনাল কায়েদ জনাব হাফিজুর রহমান। এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া তেবাড়িয়ার কায়েদ জনাব নাসির আহমদ।

সমাপনী অধিবেশনে মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া বাংলাদেশ এর সদর জনাব মুহাম্মদ জায়েদ আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা জনাব আবুল কালাম আজাদ। তিনি তার বক্তৃতায় মুক্তিযুদ্ধকালীন বিভিন্ন ঘটনার স্মৃতিচারণ করেন।

সভাপতির ভাষণে জনাব মুহাম্মদ জাহেদ আলী, মাদকমুক্ত, দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশ গঠনে সংগঠনের সকলকে কাধে কাধ মিলিয়ে কাজ করতে নির্দেশ দেন। বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মধ্য পুরস্কার বিতরণ করেন সভাপতি। শেষে মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের আত্মার মাগফেরাত কামনার উদ্দেশ্যে সম্বেলিত দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হয়।

১৬ই ডিসেম্বর বিজয় দিবস উদযাপন

বিজয় দিবস পালনের লক্ষ্যে গত ১৫ই ডিসেম্বর ভোর ৪.৪৫ মিনিটে বাজামাত তাহাজ্জুদ নামায পড়া হয়। অতঃপর বাজামাত ফজর নামায পড়ার পর ওয়াকারে আমল করা হয়।

অতঃপর উক্ত দিবস পালনের লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত সেমিনারে আলোচনা হয়। উক্ত সেমিনারে আনাসার, খোদ্দাম ও আতফাল মিলে ২৩ জন সদস্য উপস্থিত ছিল।

আরিফ আহমদ (সুমন), প্রেসিডেন্ট
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, নাসেরাবাদ

ধর্মীয় সম্প্রীতি: বড়দিনের শুভেচ্ছা জানিয়ে কুরআন শরীফ উপহার

'ভালবাসা সবার তরে, ঘৃণা নয় কারো পরে' এই স্লোগানকে সামনে রেখে ধর্মীও সম্প্রীতি ও প্রতিবেশীর প্রতি দায়িত্ব পালনে ২৫ ডিসেম্বর খুলনাস্থ সেন্ট যোসেফস্ ক্যাথিড্রাল পরিদর্শন এবং বড়দিনের শুভেচ্ছা বিনিময় করে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের যুব সংগঠন।

শুভেচ্ছা বিনিময় শেষে ইসলামে ধর্মীয় সম্প্রীতির গুরুত্ব ও হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রকৃত শিক্ষা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। এ সময় বড়দিনের উপহার হিসেবে একটি কুরআন শরীফ প্রদান করা হয় ক্যাথিড্রালের সম্মানিত প্রধান ফাদার আনন্দ সেবাস্তিয়ান মন্ডলের হাতে।

উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আহমদীয়া মুসলিম যুব সংগঠনের বিভাগীয় প্রধান ডা. মাহমুদ আহমদ ও স্থানীয় প্রধান শেখ মুহাম্মদ ওমর।

এ ছাড়াও সাতক্ষীরা ও সিলেটসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে বড়দিন উপলক্ষে শুভেচ্ছা বিনিময় এবং ইসলামের অনিন্দ্য শিক্ষার দাওয়াত পৌঁছানো হয়। বিশেষ করে সাতক্ষীরায় খ্রিস্টানদের জেলা মিশন হাউজের ফাদার লুইজকে এবং সিলেট শহরের খ্রিস্টান চার্চের পাদ্রী নিঝুম সাংমাকে নিখিলবিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের বর্তমান খলিফার রচিত পুস্তক 'বিশ্ব সংকট ও শান্তির পথ' এবং ইসলামের অনিন্দ্য শিক্ষামালা সংক্রান্ত বই-পুস্তক প্রদান করা হয়।

এ সময় তারা আহমদীয়া যুব সংগঠনের এ উদ্যোগকে স্বাগত জানান এবং প্রশংসা করেন।

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া চট্টগ্রাম সিলেট রিজিওনের পক্ষ থেকে সিলেট শহরের খ্রীষ্টান চার্চের পাদ্রী নিঝুম সাংমা ও সিলেট শহরের রামকৃষ্ণ মিশনের প্রধান মহারাজের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করা হয়। এসময় হুযূর (আই.)-এর পুস্তক বিশ্ব সংকট ও শান্তির পথ উপহার দেয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন ডা. এখতিয়ার উদ্দিন শুভ, রিজিওনাল কায়েদ, চট্টগ্রাম সিলেট রিজিওন, নায়েব রিজিওনাল কায়েদ-২, জেলা মোতামাদ এবং মুহাম্মদ আহসান, কায়েদ সিলেট।

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া সুন্দরবনের পক্ষ থেকে বড়দিন উপলক্ষে জেলা শহর সাতক্ষীরায় খ্রিষ্টানদের জেলা মিশন হাউজের ফাদার লুইজকে শুভেচ্ছা ও ইসলামের দাওয়াত প্রদান করা হয়।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা "পাক্ষিক আহমদী" পত্রিকার সম্মানিত গ্রাহকগণকে বিশেষভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছর শেষ হয়ে গিয়েছে। গ্রাহকগণের অনেকেরই গত বছরের গ্রাহক চাঁদা বাকী রয়ে গিয়েছে। ইতোমধ্যে নতুন অর্থ বছর শুরু হয়েছে। তাই অনুগ্রহ পূর্বক প্রত্যেকে গত বছরের বকেয়া গ্রাহক চাঁদা (প্রতি বছর ২৫০/- টাকা হারে) পরিশোধ করে বাধিত করবেন। পাক্ষিক আহমদী সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য পেতে যোগাযোগ করুন: ফারুক আহমদ বুলবুল, সহকারী লাইব্রেরীয়ান, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ।
মোবাইল নং- ০১৭৩৬১২৪৭০৪, ০১৯১২৭২৪৭৬৯
ওয়াসসালাম

খাকসার

সেক্রেটারী ইশায়াত
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর হাতে

বয়আত গ্রহণের দশটি শর্ত

১

বয়াত গ্রহণকারী সর্বান্তঃকরণে অঙ্গীকার করবে, এখন হতে ভবিষ্যতে কবরে যাওয়া পর্যন্ত শির্ক হতে পবিত্র থাকবে।

২

মিথ্যা, ব্যভিচার, কামলোলুপ দৃষ্টি, প্রত্যেক পাপ ও অবাধ্যতা, যুলুম ও খেয়ানত, অশান্তি ও বিদ্রোহের সকল পথ হতে দূরে থাকবে। প্রবৃত্তির উত্তেজনা যতই প্রবল হোকনা কেন, তার শিকারে পরিণত হবে না।

৩

বিনা ব্যতিক্রমে খোদা ও রসূল (সা.)-এর নির্দেশ অনুযায়ী পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়বে, সাধ্যানুযায়ী তাহাজ্জুদ নামায পড়বে, রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি দরূদ পাঠ করবে, প্রত্যহ আল্লাহ্ তা'লার সমীপে নিজের পাপসমূহের ক্ষমা প্রার্থনা করবে আর প্রতিনিয়ত ইস্তেগফার করায় মনোনিবেশ করবে। ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে তাঁর অপার অনুগ্রহ স্মরণ করে তাঁর প্রশংসা ও বড়াই করবে।

৪

উত্তেজনার বশে অন্যায়রূপে, কথায়, কাজে বা অন্য কোন উপায়ে আল্লাহ্র সৃষ্ট কোন জীবকে, বিশেষতঃ কোন মুসলমানকে কোন প্রকার কষ্ট দিবে না।

৫

সুখে-দুঃখে, কষ্টে-শান্তিতে, সম্পদে-বিপদে সকল অবস্থায় খোদা তা'লার সাথে বিশ্বস্ততা রক্ষা করবে। সকল অবস্থায় তকদীরের বিধানের প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে। তাঁর পথে প্রত্যেক লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও দুঃখ-কষ্ট বরণ করে নিতে প্রস্তুত থাকবে। কোন বিপদ উপস্থিত হলে পশ্চাদপদ হবে না, বরং সম্মুখে অগ্রসর হবে।

৬

সামাজিক কদাচার পরিহার করবে। কুপ্রবৃত্তির অধীন হবে না। কুরআনের অনুশাসন সম্পূর্ণরূপে শিরোধার্য করবে এবং প্রত্যেক কাজে আল্লাহ্ ও রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের আদেশকে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে অনুসরণ করে চলবে।

৭

অহংকার ও গর্ব সর্বতোভাবে পরিহার করবে। দীনতা, বিনয়, শিষ্টাচার, সহিষ্ণু ও দরবেশী জীবন যাপন করবে।

৮

ধর্ম ও ধর্মের সম্মান করাকে এবং ইসলামের প্রতি আন্তরিকতাকে নিজ প্রাণ, মান-সম্ভ্রম, সন্তান-সন্ততি ও সকল প্রিয়জন হতে প্রিয়তর জ্ঞান করবে।

৯

আল্লাহ্ তা'লার প্রীতি লাভের উদ্দেশ্যে তাঁর সৃষ্ট জীবের সেবায় যত্নবান থাকবে এবং খোদার দেওয়া নিজ শক্তি ও সম্পদ যথাসাধ্য মানব কল্যাণে নিয়োজিত করবে।

১০

আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ধর্মানুমোদিত সকল আদেশ পালন করার প্রতিজ্ঞায় এই অধমের সাথে যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হলে, জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত তাতে অটল থাকবে। ভ্রাতৃত্ব বন্ধন এতো বেশি গভীর ও ঘনিষ্ঠ হবে, জগতের কোন প্রকার আত্মীয় সম্পর্কের মাঝে এর তুলনা পাওয়া যাবে না।

(মজমুআ ইশতেহারাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৮৯-১৯০, ১২ জানুয়ারি ১৮৮৯)

New Vol. No. 82 | 13th Issue

The Ahmadi Fortnightly Since 1922

15th January, 2020 Tk. 20.00
Regd. No. D. A.-12

এমটিএ-তে সরাসরি হুযূর (আই.)-এর জুমুআর খুতবা শুনুন এবং নিজেকে আধ্যাত্মিকভাবে জীবিত রাখুন

এমটিএ-তে খুতবা প্রচারের সময়সূচি

(১) শুক্রবার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭.০০ সরাসরি সম্প্রচার। পুনঃপ্রচার রাত ১০.২০ মিনিট এবং ভোর-রাত ৪.০০।

(২) শনিবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় সকাল ৮.১০ এবং বিকাল ৫.০০।

(৩) রবিবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭.০০।

(৪) বৃহস্পতিবার একই খুতবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় রাত ৮.০০।

Muslim TV AHMADIYYA International

mta INTERNATIONAL

এমটিএ দেখুন অবক্ষয়মুক্ত থাকুন!

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন ০১৯১২-৭২৪৭৬৯

Right Management Consultants

Software Developer & MIS Solution Provider

Md. Musleh Uddin
CEO & MIS Consultants
BPL Bhaban, Suite # 303, 2nd floor, 89-89/1 Arambag, Motijheel, Dhaka-1000
E-mail: right_mc@yahoo.com, rightmc@gmail.com, web: www.rightmc.org
Cell: 01720 340 030, Land Phone: 7191965

জলই জীবন/ WATER THERAPY

জল চিকিৎসায় নিম্নবর্ণিত রোগসমূহ নিরাময় হয় :

(১) কোষ্ঠ কাঠিন্য (Constipation)- ১০ দিন পর এই চিকিৎসায় সর্বপ্রথম ফল পাবেন, (২) পাকাশয়জনিত রোগসমূহ (Gastric Problems)- ১০ দিন, (৩) উচ্চ রক্তচাপ (Hipertension)-১ মাস, (৪) বহুমুত্র (Diabetes)-১ মাস, (৫) ক্ষয়রোগ (Tuberculosis)-৩ মাস, (৬) চক্ষুকর্ণ নাসিকা রোগ (ENT Diseases)-৩ মাস, (৭) মুত্রথলী গ্রন্থি বৃদ্ধি রোগ (Enlargement of Prostate Gland)-৩ মাস, (৮) কর্কট রোগ (Cancer)-প্রথম থেকে রোগ ধরা পরলে ৬ মাস, (৯) পুরনো কঠিন চর্মরোগ-১ বছর।

জল চিকিৎসার নিয়ম :

(১) ঘুম থেকে উঠে মুখ না ধুয়ে কুলকুচি না করে (without mouth washing) শান্তভাবে ধীরে ধীরে ১.২৬০ লিটার অর্থাৎ বড় গ্লাসের ৪ গ্লাস জল পান করতে হবে। তাড়াহুড়া করা যাবে না। জলপান করার পর ৪৫ মিনিট কোন তরল বা শক্ত খাদ্য (Liquid or solid food) খাওয়া যাবে না। ধূমপান করা যাবে না।

(২) প্রাতঃরাশ, দুপুর ও রাতের আহার (Breakfast, Lunch and Dinner) করার সময় জল পান করা যাবে না। অসুবিধা হলে গলা ভেজাবার জন্য ২/৩ চামচ পরিমাণ জল খেতে পারেন। এই পরিমাণ বাড়ানো যাবে না। দুই ঘন্টা পর ইচ্ছেমত জল পান করা যাবে, দুর্বল বা অসুস্থ হলে চার গ্লাসের পরিবর্তে ১ অথবা ২ গ্লাস দিয়ে শুরু করতে পারেন। তবে অবশ্যই চার গ্লাস পান করতে হবে। যে কোন রোগই জল চিকিৎসায় নিরাময় হতে পারে। বাতজনিত রোগে প্রথম ৭ দিন সকালে ও বিকালে ২ বার এই চিকিৎসা করতে হবে। উপশমের পর শুধু সকালে করলে চলবে।

(৩) দুপুর ও রাত্রে আহার করে শোয়ার পূর্বে অন্ততঃ আধাঘন্টা অপেক্ষা করতে হবে। ঘুমানোর পূর্বে কোন কিছু আহার করা যাবে না। অসুবিধা মনে হলে ঘুমানোর আগে ২/৩ চামচ জল পান করা যাবে।

ধানসিড়ি রেস্টুরেন্ট

ধানসিড়ি রেষ্টুরেন্ট
দোতলা
রোড নং-৪৫, প্লট-৩৩, গুলশান-২, ঢাকা-১২১২
ফোনঃ ৯৮৮২১২৫
মোবাইলঃ ০১৭০০৮৩৩২৫২, ০১৯৩০২১৪২৮৪

Printed and Published by **Alhaj Mahbub Hossain M.A.** at Ahmadiyya Art Press, 4 Bakshi Bazar Road Dhaka-1211 on behalf of Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh
Editor in Charge: **Mohammad Habibullah**
www.ahmadiyyabangla.org, www.alislam.org, www.mta.tv
Phone: 57300808, 57300849, Fax: 0088-2-57300880, e-mail: pakkhikahmadi.bd1922@gmail.com
www.theahmadi.org (Pakkhik Ahmadi web site live now)